ক্ষমা নেই

- আবদুল করিম রাশেদ

এসএসসি পরীক্ষা শেষ। ভাবলাম নানুবাড়ি থেকে ঘুরে আসি। তখন ২০০১ সালের ১ এপৃল। আমার বাবা ও বড় ভাই ছাড়া আমরা সবাই গেলাম। আমাদের দেখে নানুবাড়ির সবাই অবাক! কারণ প্রায় চার বছর পর গেলাম।

কয়েকদিন থাকার পর বলি, নানু, আমরা নৌকা ভ্রমণ করবো।

আমার নানুর বাড়ির প্রায় দুই কিলোমিটার দক্ষিণে ফেনী নদী।

মামাকে বলে তিনটি রিকশা ঠিক করালেন নানু।

অনেক কৌতূহল নিয়ে আমরা নৌকায় উঠি।

আমরা রিজার্ভ কোনো নৌকা পাইনি। তাই বড় একটা নৌকায় অপরিচিত চার পাচজনসহ উঠলাম। এদের মধ্যে একটি সুখী দম্পতি আছে এবং তাদের কোলে দুই তিন বছরের একটি ফুটফুটে সন্তান। নৌকায় বসে নদী ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছি।

এরই মধ্যে ওই দম্পতির ছেলেটির সঙ্গে আমার ভাব জমে গেল। তাকে আমি কোলে নিলাম।

সে আমাকে *চাচ্চু* বলে ডাকতে শুরু করলো। অনেকক্ষণ ছেলেটি আমার কোলে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলতে লাগলো।

আমি তাকে ধরে রাখলাম। আমি ছেলেটির বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলে তাদের পরিচয় জানলাম। তাদের বাড়ি নাকি সাভার। এখানে নানাশ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসেছেন।

এরই মধ্যে হঠাৎ ছেলেটি আমার কোল থেকে লাফ দিয়ে নদীতে পড়ে গেল। নদীটা খুব খরস্রোতা। চিৎকার দিয়ে উঠলাম, বাবু পানিতে পড়ে গেছে!

সঙ্গে সঙ্গে দুটি লোক নৌকা থেকে ঝাপ দিয়ে পানিতে নামলো। তখন আমাদের নৌকা বাবু থেকে দুইশ গজ দূরে।

আমি সাতার জানি না। জানলে আমিও নামতাম। শিশুটি পানিতে ডুবে গেছে। এদিকে ছেলের মা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন এবং তার বাবা কাদতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ খোজার পরও তাকে পাওয়া গেল না।

মাঝি নৌকা তীরে ভেড়াচ্ছেন। চারদিক থেকে আরো অনেক মানুষ এসে জড়ো হলেন। প্রায় আধা ঘণ্টা পর আমাদের নৌকা থেকে খানিকটা দূরে ছেলেটির লাশ ভেসে উঠলো।

মাঝি সাতরিয়ে লাশটি নৌকায় আনলেন।

মৃত ছেলেকে জড়িয়ে ধরে তার বাবা কাদতে লাগলেন।

আমি শুধু নীরব দর্শক হয়ে দেখছি।

তারপর ছেলেটাকে নিচে রেখে তার বাবা আমাকে প্রচণ্ড মার শুরু করলেন।

এমন সময় তিনি আমাকে একটা কাঠ নিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিলেন।

কিন্তু তাতে কোনো দুঃখ পাইনি।

অন্যান্য লোকজন তার কাছ থেকে আমাকে ছাড়ালেন।

ছেলেটির মায়ের জ্ঞান ফেরার পর তিনি আমাকে অনেকগুলো চড় মাড়লেন।

তাদের কাছে ক্ষমা চাইলাম।

তারা আমাকে ক্ষমা করলেন না।

আমি জানি, তাদের অন্তরে অনেক বড় আঘাত দিয়েছি। সেই করুণ, মর্মস্পর্শী, বেদনাদায়ক দুঃখের কথা আজো ভুলিনি।

ফুলগাজী, ফেনী থেকে

এক বোতল

– কবির আহম্মেদ

বন্ধুর বিয়ে হচ্ছে খুব জাকজমকভাবে। আমরা বন্ধুরা প্রায় পচিশজন। লঞ্চের নিচ তলায় মহিলা, উপর তলায় আমরা। মাইকে গান বাজছে, *কেহ দোনা কেহ দোনা ইউ আর মাই সনিয়া*।

আমরা বসে গেলাম নানান আড্ডায়। কেউ গল্প করছে কেউ তাশ খেলছে।

মহিলারা ব্যস্ত শাড়ির রঙয়ের সঙ্গে ব্রা ও ব্লাউজ নিয়ে। রূপচর্চার জন্য আছে নানান সামগ্রীও ছোট–বড় আয়না।

আমাদের মধ্যে কয়েকজনার আছে মদ খাওয়ার বাজে অভ্যাস। তার মধ্যে শিপলুর অভ্যাস একটু বেশি। তবে আমরা একে কখনোই বেশি দিতাম না। সবার খাওয়া শেষ হলে আধা গ্লাস দিতাম।

শিপলু কখনো জোরাজুড়ি করতো না। বলতো, একদিন তোদেরকে ঠকাবো।

আমরা কয়েকজন যখন গ্লাস নিয়ে বসে ব্যাগ থেকে মদ–এর বোতল বের করার জন্য হাত দিলাম তখন দেখি বোতল নেই।

সবাই অবাক!

দিপকের ব্যাগে বোতল ছিল। তাই দিপককে আমরা সবাই যা ইচ্ছা তা–ই গালমন্দ করতে লাগলাম।

হঠাৎ শিপলুর চেচামেচি শুনতে পেলাম।

সবাই ছুটে গেলাম। দেখলাম শিপলু লঞ্চের সামনে দাড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্য করে বলছে, দেখো দেখো সব নৌকাগুলো পাড়ে উইঠ্যা গেছে। নদীতে একটুও জল নেই।

তার কথায় বুঝলাম ওই আজ পুরো এক বোতল খেয়েছে। এতোই নেশায় ধরেছে যে, চলতি লঞ্চ থেকে পানি নেই বলে লাফ দিতে চাচ্ছে।

আমরা সবাই তাকে ধরে লঞ্চের ভেতরে নিয়ে এলাম। খাওয়াটা এতোই অতিরিক্ত হয়েছে যে, বাজে বকতে বকতে বমি করা শুরু করলো। নদী থেকে বালতি দিয়ে জল তুলে শিপলুকে গোসল করলাম। এরপর এক ঘুমে ভোর হলো।

লঞ্চ গন্তব্য পৌছে যাওয়ার সময় হলো।

শিপলু ঘুম থেকে উঠে বোতল নিয়ে আমাদেরকে বলছে, কি রে, বলেছিলাম না, একদিন তোদের সবাইকে ঠকাবো। আজ কেমন হলো?

সবাই দুষ্টামির ছলে কিল–ঘুষি মারলাম। মজা করলাম।

এরপর থেকে যে কয়বার বন্ধুর বিয়েবার্ষিকী পালন করেছি। আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি ততোবারই শিপলুকে আধগ্লাস দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছি।

লঞ্চ দিয়ে বেড়াতে যাওয়ার ঘটনার মধ্যে শিপলুর এক বোতল খাওয়ার মুহূর্তটা আজও আমাকে হাসায়। মনে করিয়ে দেয় *তোদেরকে একদিন ঠকাবো* শিপলুর সেই স্মরণীয় লাইনটি।

ভোলা থেকে

ভয়াল সন্ধ্যা

- মাহবুব সোবহানী

রিকশা থেকে নেমে দৌড়ে লঞ্চ টার্মিনালে পৌছালাম। ঘড়ির কাটা ছয়টা ছুয়েছে। নরসিংদী থেকে নবীনগরগামী শেষ লঞ্চটা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে অবস্থা। লঞ্চে উঠতে পেরে হাপ ছেড়ে বাচলাম।

এটা জুলাই ১৯৯৬-এর ঘটনা। সবে তখন ক্লাস সিক্স-এ পড়ি। গ্রামের বাড়ি থেকে খবর এলো চাচাতো বোনের বিয়ে দুই দিন বাদে। আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল আমি আর বাবা যাবো দিনের শেষ লঞ্চে চেপে বাবা অফিস থেকে ফিরলেই। অফিসে কি জরুরি কাজে আটকে গেলেন তিনি।

অগত্যা আমাকে একাই পাঠানো হলো। সঙ্গে বিয়ে উপলক্ষে দেয়া হাজার ছয়েক টাকা।

আম্মা কায়দা করে টাকাগুলো আমার ডান পায়ের কালো শু-এর মধ্যে ঢুকিয়ে ফিতেটা বেধে দিলেন।

ছয়টার মিনিট খানেক পর লঞ্চ ছাড়লো। আমার গন্তব্য ছলিমগঞ্জ। সেখানে পৌছাতে সাড়ে আটটা বেজে যাবে। নরসিংদী থেকে ছাড়ার পর পরবর্তী ঘাট মরিচাকান্দি। তাও দেড় ঘণ্টার পথ। এ লম্বা সময় কিভাবে কাটাবো ভাবছিলাম লঞ্চের রেলিং ঘেষে দাড়িয়ে। এ রুটের লঞ্চগুলো অন্য সব নৌরুটের লঞ্চের মতো, আকারে বড় নয়, আরামেও শৌখিন নয়। দোতলায় সাধারণ ক্যাবিন এবং নিচতলায় শাদামটা বেঞ্চি পাতা। দিনের শেষ লঞ্চ বলেই হয়তো যাত্রীর পরিমাণ অল্প বিস্তর বেশি। অধিকাংশই ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক কাজকর্ম শেষে শহর থেকে গ্রামে ফিরছে। সময় কাটানোর জন্য কয়েকজন আবার বৃত্ত পাকিয়ে মোনাজাতের ভঙ্গিতে বসে গিয়েছে তাশ খেলায় পেছনের খোলা অংশে।

এ লঞ্চ রুটটিতে দিনের শেষ লঞ্চগুলো প্রায়ই ডাকাতির শিকার হয়। স্পট হিসেবেও মধ্য মেঘনার বিশেষ কুখ্যাতি। লঞ্চের রেলিং ধরে যখন আকাশ দেখছিলাম তখন কি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিলাম কি দুর্গতি সামনে ওৎ পেতে আছে!

সাড়ে ছয়টা নাগাদ। অতোবড়ো টকটকে লাল সূর্যটা মেঘনার ঘোলা জলে টুপ করে ডুবে গেল। মিনিট দশকের মধ্যেই চারদিকে পুরো অন্ধকার করে এলো। ক্যাবিনে লাইট জ্বললো, নিচে হারিকেন। হঠাৎ তাশ খেলতে বসা লোকগুলোর মধ্যে যেন কেমন তৎপরতা লক্ষ্য করা গেল। হ্যা, তারা সংখ্যা ছয়জন। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কিছু দেশি অস্ত্র যেমন ড্যাগার, রামদা, কিরিচ নিয়ে হামলা চালিয়ে বেধে ফেললো লঞ্চের সারেংকে। ক্যাবিনের লোকজন টু শব্দটিও করার সাহস পেল না। নিচ তলার দরজাটা আটকে দিয়ে লঞ্চের সামনে ও পেছনের যাতায়াত পথে অবস্থান নিল দুজন। বাকি চারজনে মিলে অস্ত্রের মুখে রেলিং, ডেক আর ছাদে যারা ছিল সকলকে তাড়িয়ে এনে ক্যাবিনে ঢোকালো।

অবস্থা বেগতিক দেখে আমি আগেই ক্যাবিনে ঢুকে গিয়েছি। ভয়ে সর্বাঙ্গ কাপছিল। স্রষ্টাকে স্মরণ করছিলাম আর কেন জানি বাবা মায়ের চেহারা দুইখানি খুব মনে পড়ছিল।

হঠাৎ আমাদের মধ্য থেকে এক রোগা পটকা লোক ক্যাবিনের দরজা একটু ফাক করেই দিল পেছন দিকে ঝেড়ে দৌড়।

ধাই করে রামদা চালালো ডাকাতদের একজন। কোপটা ভালোভাবে না লাগলেও বিফলে গেল না একেবারেই। লোকটার পিঠের অনেকখানি অংশ ফাকা করে দিয়ে বেরিয়ে এলো রামদা।

দমেনি লোকটা। লুঙ্গি চেপে ধরে সোজা গিয়ে ঝাপ দিল লঞ্চের পেছন দিকে। এমন সহিংসতা চোখে দেখে কারোরই সাহস হলো না হিরোইজম ফলানোর।

লঞ্চ তখন ভরা যৌবনা মেঘনার মাঝখানটায় ঢেউয়ের তালে দোল খাচ্ছিল নিশ্চুপ দাড়িয়ে। ইঞ্জিন বন্ধ বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ। মিনিট পাচেকের মধ্যে লঞ্চের গায়ে এসে ভিড়লো একটা ছোট ইঞ্জিনচালিত নৌকা।

উঠে এলো আরো সাত আটজন অস্ত্রধারী। সকলের মুখই মাফলার এবং চাদরে ঢাকা। এরপর শুরু হলো আসল কাজ। যাত্রীদের মধ্যে দেওয়ান বেপারী নামে একজনের খোজ করলো তারা। তাকে পাওয়া গেল না। এ কারণে তাদের মধ্যে যেন চাপা অসন্তোষ। একজন একজন করে ডেকে তল্লাশি করে যা নেয়ার মতো ছিনিয়ে নিচ্ছিল। তারপর ঠেলে ঢোকানো হচ্ছিল ক্যাবিন সংলগ্ন টয়লেট আর সরু লেডিস ক্যাবিনে। টাকা–কড়ি, ঘড়ি, গলার চেইন, সোনার আংটি, দামি পাঞ্জাবি এবং মালপত্র বাদ গেল না কিছুই। এক প্রৌঢ়ার কান থেকে টান দিয়ে ছিড়ে নেয়া হলো কানের দুল। মহিলা দিতে চাচ্ছিলেন না তার বিয়ের স্মৃতি বলে।

একে একে আমাকে তল্লাশির পালাও এসে গেল। আমাকে শার্টের কলার ধরে টেনে টর্চের আলোর সামনে আনতেই ভয়ের চোটে প্যান্ট ভিজিয়ে এক নাম্বার করে ফেললাম।

আমার এ বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা দেখে একজন কষে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল আমার বাম গালে।

সত্যি স্বীকার করা দোষের নয়। সে থাপ্পড় খেয়ে আমি বোধ করি দুই নাম্বার বাথরুমও সেরে ফেলেছিলাম প্যান্টের মধ্যেই। কানের ভেতর শো শো করছিল। মাথার ভেতর তারা ভরা আকাশ যেন ঘুরপাক খাচ্ছিল। ছিটকে গিয়ে পড়েছিলাম লেডিস ক্যাবিনের পাশে। আমাকে আর ঘাটানো হলো না।

এরপর মিশন চললো নিচ তলায়। এবারও ব্যর্থ মিশন। দেওয়ান বেপারী নিচ তলায়ও নেই। মিনিট পনেরো বাদে ডাকাতরা নৌকায় করে দ্রুত কেটে পড়লো। তখন সারা লঞ্চ জুড়ে শুরু হলো কান্নাকাটির হল্লা। হায়রে এই নিল রে, সেই নিল রে।

অবশেষে সারেংকে বাধনমুক্ত করে বহু ঘটনার পর বাসায় পৌছলাম সাড়ে এগারোটায়। সেই দুর্ধর্ষ ডাকাতির কথা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। কারণ ডাকাতের সেই রাম থাপ্পড় খেয়ে আমার বাম কানের শ্রবণ শক্তি বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

পরে জেনেছিলাম যে, দেওয়ান বেপারী ছিল গরুর ব্যবসায়ী। ডাকাতদের টার্গেট ছিল তার কাছ থেকে কিছু নগদ টাকা হাতিয়ে নেয়া। কিন্তু বেচারা ডাকাতের কোপ খেয়ে লঞ্চের পেছন দিকে লাফিয়ে পড়লেও লঞ্চের প্রপেলারের আঘাত খেয়ে মারা পড়েছিল।

যখন এ কাহিনী লিখছিলাম, কানটা ঝা ঝা করছিল। আমার আবারও মনে পড়লো সেই প্যান্ট নষ্ট করা ভয়াল সন্ধ্যার কথা।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে

ঘোল খাওয়া

- সেফাম আহম্মেদ ডন

ঘটনাটা ১৯৯৯ সালের। তখন সবে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। আমার বন্ধুর তখন নতুন একটা প্রেম হয়ে গেল। অথচ মেয়েটিকে প্রথম আমিই টার্গেট করেছিলাম। ইতিমধ্যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বন্ধুর সম্পর্ক গভীর হয়ে গেছে। এমনকি কয়েকবার ডেটও হয়েছে। হঠাৎ বন্ধুটি আমাকেসহ ডেটিংয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম করলো।

সময় মতো মেয়েটি এসে হাজির।

আমাদের ডেটিং স্পট ছিল শীতলক্ষ্যা নদী। পঞ্চাশ টাকা ঘণ্টা হিসেবে একটা নৌকা ভাড়া করলাম। নৌকাতে তিনজনে মিলে বেশ আড্ডা দিলাম। হঠাৎ বন্ধুর গোপন ইশারায় আমি ছইয়ের বাইরে এসে দাড়ালাম। এই সুযোগে বন্ধুটি তার প্রেমিকার বুকের ওড়না সরিয়ে সেখানে মুখ ঘষছে দেখতে পেলাম ছইয়ের ফাক দিয়ে।

এই দৃশ্য দেখে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছি ঠিক এমন সময় একটি ইঞ্জিন নৌকা এসে আমাদের নৌকার সঙ্গে ধাক্কা খেলো। সঙ্গে সঙ্গে সাত আটজন ছেলে নেমে এলো আমাদের নৌকায় এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে লাগলো। অবশেষে তারা বললো, পাচ হাজার টাকা দিতে হবে।

আমরা বললাম, ভাই, এতো টাকা তো নেই।

তখন তারা বললো, তাহলে মালটারে রাইখা যা।

এই কথা শুনে চোদ্দ বছরের মেয়েটি কেদেই ফেললো।

অবশেষে অনেক কথাবার্তার পরে দেড় হাজার টাকা নিয়ে তারা বিদায় হলো।

তারপর আমরাও তাড়াতাড়ি ঘাটে ফিরলাম।

এরপর থেকে কখনো মেয়েটি তার স্কুল ফাকি দিয়ে আসেনি ডেট করতে। আমার সেই বন্ধুটিও তাকে ধীরে ধীরে ভুলে গেল। কিন্তু আমরা দুই বন্ধু এখনো ওই ভয়ংকর নৌ ভ্রমণটি ভুলতে পারিনি।

মাসদাইর, নারায়ণগঞ্জ থেকে
tufan_boishak@yahoo.com

ভেলা

- এফ.এম রবিউল ইসলাম রাজু

১৯৮৮ সাল। তখন আমি সবেমাত্র ক্লাস থৃ-র ছাত্র। আমার মনে হয় অনেকেরই ওই বছরটির কথা মনে আছে প্রলয়ংকরী ঝড় ও বন্যার জন্য। ঠিক সেই দিনটির কথাই আজ লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

তারিখটা মনে নেই। তবে যেদিন ঝড় হয়েছিল তার আগের দিন থেকেই রেডিও, টিভিতে মংলা সমুদ্র বন্দরকে দশ নাম্বার মহা বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হলো আর নদীর পানি স্বাভাবিকের চেয়ে চোদ্দ থেকে ষোল ফিট উচ্চতায় প্রবাহিত হবার কথা বলা হচ্ছিল। আমার বাবা তখন পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলায় কর্মরত। আমরা থাকি উপজেলা কোয়ার্টারের একটি দুই তলায়।

নিচ তলায় একাউন্টস অফিসার আংকল আর টুইন কোয়ার্টারে মুনসেফ ও কৃষি অফিসার আংকল থাকতেন। তাদের ছেলেমেয়েরা তখন আমার বন্ধু। সকলে একত্রে স্কুলে যেতাম-আসতাম। স্কুলটি ছিল আমাদের বাসার পেছনে বারইখালী প্রাইমারি স্কুল। স্কুল থেকেই শুনে এলাম আগামীকাল ঝড় হবে। ব্যস, বিকেলবেলা আম্মার বকুনি খেয়েও ইউএনও আংকলের বাগান থেকে আমরা কয়েকজন মিলে ছোট ছোট চারটি কলা গাছ কেটে আনলাম। উদ্দেশ্য ভেলা তৈরি করে বন্যার পানিতে ঘুরে বেড়ানো। সেই সঙ্গে চোদ্দ ফিট আর ষোল ফিট বরাবর বিল্ডিংয়ের গায়ে দাগ দিয়ে রাখলাম।

রাতে হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। খাবার পর ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝ রাতে আম্মার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি আমাদের বাসা ভর্তি মানুষ। বাইরে ঝড় হচ্ছে। আর সে কি বাতাস! পানিও বাড়ছে হু হু করে।

কৃষি অফিসার আংকল তার হ্যান্ড মাইকে সকলকে ডেকে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলছেন।

মুনসেফ আংকল আর একাউন্টস অফিসার আংকলও আমাদের বাসায়। শাওন, সুমী, বাবু, লিজা এবং আমি বিছানায় বসে দুষ্টুমি করছি, মুনসেফ আংকলের আনা ফলগুলো নিয়ে ঝগড়াও করছি। এমন সময় আমাদের বাসার পেছনের জানালা ভেঙে গেল। প্রচণ্ড বাতাস বিদ্যুৎ চমক দেখে আমরা খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছি। বিদ্যুৎ চমকে উঠলে দেখতে পেলাম আমাদের স্কুল ঘরটি দাড়িয়ে নয়, শুয়ে আছে।

পানির লেভেল তখন বারো ফিট ছাড়িয়ে দুই তলার মেঝের ওপর। রুমের মধ্যে মহিলারা কান্নাকাটি আর উচ্চ স্বরে কোরআন শরিফ পড়ছেন। পুরুষ মানুষ যারা ছিলেন তারা উপজেলার একমাত্র তিন তলা বিল্ডিংয়ে কিভাবে যাওয়া যায় সে চিন্তায় ব্যস্ত।

স্টোর রুম থেকে নৌযান হিসেবে বের করা হলো চাউল রাখা খালি দুটি ড্রাম। এমন সময় কেউ একজন বললো, কলার ভেলাটা সিড়ি ঘরে বাধা রয়েছে।

সকলেই খুশি হলো। আর একটু পানি বাড়লেই ওগুলো ব্যবহার করা হবে।

এর মাঝে এক প্রবীণ ব্যক্তি চিৎকার করে বললেন, এই শিশুরা, ভয় নেই, পানি পাক খায়।

তখন জানতাম না পানির পাক খাবার অর্থ কি। পরে জানলাম পানি ঘুরতে শুরু করলে বোঝা যায় নদীর পানি আর বাড়বে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় কমে এলো, শুরু হলো বৃষ্টি। বাইরে যান্ত্রিক শক শুনে আমরা আবার ভীত হলাম। এবার দুই তলার বারান্দায় স্পিডবোটে কিছু খাবার নিয়ে হাজির হলেন ইউএনও আংকল। যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন আমাদের তৈরি খুদে নৌযান যদি কারো প্রয়োজন পড়ে।

আজ বাবা বেচে নেই, শুনেছি ইউএনও আংকলও বেচে নেই। ছোটবেলার খেলার বন্ধুরা যাদের নিয়ে ছোট নৌযান তৈরি করেছিলাম তারা কোথায় তাও জানি না। আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার। অনেক কিছুই তৈরি করি এবং করবো। কিন্তু সেদিনের সেই ছোট ভেলা তৈরি করে যে প্রশংসা আর আনন্দ পেয়েছিলাম তা হয়তো কোনোদিনই পাবো না।

রুয়েট, রাজশাহী থেকে
razu_98126@yahoo.com

সেকাল একাল

- এম.এ বারী

১৯৬৬ সালের কথা। কৃষি ব্যাংকের চাকরির সুবাদে প্রথম পোস্টিং হয় নওগা। আমার চাকরির ধরন ছিল মাঝে বিশ দিন মফস্বল করা। সেই কারণে আত্রাই নদী বিধৌত মান্দা এবং আত্রাই থানার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটতে হয়েছে দীর্ঘ চার বছর। কখনো নৌকাযোগে কখনো বা লঞ্চযোগে। তখন শুকনো মরসুমেও আত্রাই নদীতে অনায়াসে নৌকায় যাতায়াত চলতো। বহু ঘটনা, বহু কাহিনী জমা রয়েছে আমার স্মৃতির ঝুলিতে যার দুই একটি ভ্রমণের চিত্র প্রতীকী হিসেবে তুলে ধরছি।

এক. ব্যাংকের কাজে একদিন খুব ভোরেই টুরে বের হলাম। নওগায় সাহেবগঞ্জের কাছ থেকে সান্তাহার হয়ে ট্রেনে আহসানগঞ্জ রেলস্টেশন। একটা মাঝারি নৌকা ভাড়া করে রওনা দিলাম। নদীর একটু ভাটিতে। যেখানে আত্রাই নদী নর্তকীর মতো কোমর বাকিয়েছে সেখানে মাছ ধরার একই খরা। সেখান থেকে এক টাকা দিয়ে তিনটি ইয়া দশা সাইজের চকচকে বাচা মাছ কিনলাম। পিয়ন তোফাজ্জল নৌকায় বিছানা করে দিয়ে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ছইয়ের বাইরে ট্রানজিস্টর ছেড়ে দিয়ে আয়েশ করে বসলাম। বিমল মিত্রের *কড়ি দিয়ে কিনলাম* বইখানি পাশে রেখে নদীর দুই পারের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। বর্ষাকাল। নদীর দুই পাড়ে জল উপচিয়ে পড়ছে।

বড় বড় হরেক রঙের পাল তোলা নৌকা যাচ্ছে আহসানগঞ্জের হাটে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তারা আসছে কেউ সিংড়া থেকে, কেউ বা গুরুদাসপুর, কেউ মানিকগঞ্জ, পাবনা, যশোর ইত্যাদি থেকে।

কিছু দূর গিয়ে নদীর পাড়ে দেখলাম একটি বিরাট ঘাট। নাম খুব সম্ভব পাচুপুর। বহু নারী–পুরুষ ভিড় জমিয়েছে। রবি ঠাকুরের কোনো একটা রচনায় এই রূপ একটা ঘাটের বর্ণনা পড়েছিলাম বা হুবহু না হলেও এ রকম যে, নদীর ঘাটে দেখলাম বহু নারী–পুরুষের ভিড়। কেউ বসে আছে, কেউ দাত মাজছে, কেউ বা ডুব মারছে, কেউ বাসন মাজছে, কেউ বা আবার ছেলে ঠ্যাঙাচ্ছে। বহু বছর পরও এই ঘাটে একই দৃশ্য দেখলাম।

এভাবে বলরামচক, ইসলামগাথী, বৈঠাখালী ইত্যাদি ঘাটের হরেক রকম দৃশ্য দেখে এগিয়ে চললাম। আমাদের এখন গন্তব্য মনিয়ারি ইউনিয়ন। বড় সাওতা গ্রামের নিজামুদ্দিনের কাছে শুনলাম মনিয়ারি

ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের বাড়ি কাম অফিস পতিসর গ্রামে। পতিসরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারি আছে। এ খবর আমার আগে জানা ছিল না।

রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত পতিসর দেখার দারুণ আগ্রহ জন্মালো। এক সময় আমরা পতিসরে পৌছালাম। নাগর নদীর তীরেই কুঠিবাড়ি। তোরণের ওপর দুটি সিংহ মূর্তি ঘোষণা করছে জমিদারী ঐতিহ্য। এলাকাটি নির্জন এবং চারদিকে পানি আর পানি। বুঝলাম এটা এখনো অনেকের অগোচরেই রয়ে গেছে।

ইউপি চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে অফিসের কাজ দ্রুত সেরে কুঠিবাড়িতে পৌছালাম।

চেয়ারম্যান একজন প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি যুবা বয়েসে রবিঠাকুরকে এই কুঠিবাড়িতে দেখেছেন। তিনি বললেন, বর্ষাকালে রবি ঠাকুর বোটে করে পতিসর আসতেন। সঙ্গে থাকতো পুত্র রবীন্দ্রনাথ যার হাতে খাজনা মওকুফ চাইলে রবি ঠাকুর নাকি বলেছিলেন, *বাপু হে,* তোমরা খাজনা না দিলে আমি খাবোটা কি?

চেয়ারম্যান নদীর ধারে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, রবি ঠাকুর এলে প্রজারা বড় মাছ ভেট দিতো যেগুলো জাল দিয়ে সেখানে ঘেরাও করে রাখা হতো। প্রতিদিন সকালবেলা মাছ উঠিয়ে পেট আর বুকের অংশ কেটে নিয়ে বাকি অংশ উপস্থিত সকলের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হতো। অদূরে একটি পুরনো তাল গাছ। ওটাকে নিয়ে নাকি *তালগাছ* কবিতাটি লেখা হয়েছিল।

চেয়ারম্যান আরো বললেন, আমাদের *ছোট নদী চলে বাকে বাকে* সেই ছোটদের বিখ্যাত কবিতা এই নাগর নদীকে ঘিরেই লেখা। পরবর্তীকালে জেনেছি কথাটা সত্য।

এক অমূল্য অভিজ্ঞতা নিয়ে বিকেলের দিকে রওনা হলাম রাত নয়টার ট্রেন ধরতে। তর তর করে নৌকা এগিয়ে চলেছে। মনটা তখন রবীন্দ্র ভাবনায় ব্যস্ত। এক সময় দেখলাম দিনের আলো নিভু নিভু। বিরাট এক বিলের মাঝে আমরা। পশ্চিম দিগন্তের সঙ্গে লেগে থাকা একটা গ্রাম। সেখানটায় সূর্য ডুবে গেল টুপ করে যেন ওখানটাই সূর্যের বাড়ি। কিছুক্ষণ পরে চাদের আলোয় উদ্ভাসিত হলো চারদিক। সে এক অপরূপ দৃশ্য। মনটা আন্দোলিত হলো। মাউথঅর্গান বের করে সুর তুললাম। *মম চিত্তে নিতি নৃত্যে তা তা থৈ-থৈ।*

রাত আটটা নাগাদ স্টেশনে পৌছালাম। মনে মনে ভাবলাম বগুড়া গিয়ে বাদশা, বুলু নুন্নু, মতিয়ার প্রমুখ বন্ধুদের পতিসরের গল্প শোনাতেই হবে। কেননা তারা পতিসর দেখেনি বা নামও শোনেনি।

দুই. এবারের ভ্রমণ লঞ্চযোগে। নওগা বৃজের নিচ থেকে বর্ষাকালে লঞ্চ ছেড়ে আত্রাই নদী উজিয়ে মহাদেবপুর পর্যন্ত যায়। একদিন সকালে বান্দাইখারার উদ্দেশ্যে লঞ্চে উঠে বসলাম। সহযাত্রী হিসেবে দুজন মহিলা শেষ মুহূর্তে লঞ্চে উঠলো। সম্পর্কে মা এবং মেয়ে বলে মনে হলো।

মেয়েটি গজ গজ করতে করতে সিটে বসলো।

আমি কোণায় জানলার ধারে বসে আছি।

মেয়েটি, তার মা ও পাশের দুই এক যাত্রীর সঙ্গে ঠাশ ঠাশ করে কথা বলে যাচ্ছে। যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

হট্টগোলটা বাধলো যখন টিকেট কালেক্টর এলো। মেয়েটি বলে চলেছে যে, কলেজের বেতন দেবো আবার লঞ্চের ভাড়াও দেবো! এতো ভাড়া দেবো না আমি।

আমি ওদিকটায় তাকাতে বাধ্য হলাম। মেয়েটি যে কলেজের ছাত্রী তা সবাইকে জানান দেয়ার জন্যই একটা কৌশল বলে মনে হলো। কিন্তু বচসা আর থামে না। কলেজের ছাত্রী হিসেবে তাকে সমর্থন দিয়ে টিকেট কালেক্টরকে বললাম, আরে ভাই, কলেজের ছাত্রী হিসেবে একটু কনসেশন তো দিতে পারেন। ছেলেরা হলে তো ভাড়াই দিতো না। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে অর্থাৎ আইয়ুব খার আমলে কলেজের ছাত্ররা ট্রেন-বাস বা লঞ্চে ডাবলিউটি-তে মানে উইদাউট টিকেট (WT) জার্নি করতো।

আমার কথায় কাজ হলো। কিন্তু একটি উপসর্গ দেখা দিল। মেয়েটি উৎসুখ চোখের বার বার আমার দিকে তাকাতে লাগলো। কয়েকবার দারুণভাবে চোখাচোখি হলো। তখন নিজকে উত্তমকুমার ভাবতে লাগলাম। কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার তেমন সুযোগ সৃষ্টি হলো না শুধু দূরত্বের জন্য। এক সময় আমার গন্তব্যে নেমে গেলাম।

পনেরো দিন পরে জোতবাজার থেকে ফিরতি লঞ্চে নওগা ফেরার জন্য লঞ্চে উঠে বসলাম এবং দেখলাম সেদিনকার সেই মেয়েটি এক কোণে। মেয়েটির দৃষ্টি দেখেই বুঝলাম আমাকে চিনতে পেরেছে। আবারও তাকাচ্ছে আমার পরনে জিন্স, নীল শার্ট, চোখে সানগ্লাস। যাকে বলে একেবারে ফিটেস্ট ক্যান্ডিডেন্ট।

মেয়েটি দূর থেকে অ্যাঙ্গল করেই চলেছে।

মনে মনে সাহস সঞ্চয় করলাম। মেয়েটির সঙ্গে একটু কথা বলতেই হবে। না। সম্ভব হলো না বা কোনো সুযোগ করা গেল না।

সূর্য ডোবার সময় যাত্রীদের অনেকেই ডেকে গেল।

মেয়েটিও গেল।

এই তো সুযোগ। আমিও ডেকে গেলাম। মেয়েটি যেখানে রেলিং ধরে দাড়িয়েছে তার ডান-বামে অনেক যাত্রী দাড়িয়ে গেছে। পেছন দিক দিয়ে কয়েকবার যাতায়াত করলাম। কেন যেন কিছু বলতে পারছি না।

তবে মেয়েটি আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে বলে মনে হলো। লঞ্চ তখন ঘাটে ভিড়বে ভিড়বে ভাব। মেয়েটি ঘুরে দাড়িয়ে একটু লাজুক হাসি দিয়ে দ্রুত ব্যাগপত্র নিয়ে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়েই তার মায়ের সঙ্গে যাত্রীদের মাঝে মিশে গেল। এরপরে লঞ্চে বা রাস্তাঘাটে ওই মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

ঘটনাটি এ জন্যই লিখলাম যে, সেকাল আর একাল কতো তফাত! তবে সে সময় কলেজে পড়ুয়া মেয়েদের যথেষ্ট দাম ছিল।

নাটাইপাড়া, বগুড়া থেকে

স্বামী ভাগ্য

- রাহেনা বেগম

ইংল্যান্ডে এসেছি ২ মে ২০০৪-এ। আমার বিয়ে হয়েছিল ২০০২-এ। বিয়ে হয়েছে ইংল্যান্ডে বসবাসকারী তাজুল-এর সঙ্গে। আমাদের বৃহত্তর সিলেটের লোকজন সাধারণত চান তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে প্রবাসী সিলেটিদের কাছে দিতে। সে জন্যই বর্তমান প্রজন্মের বেশির ভাগ সিলেটি ছেলেমেয়েদের স্বপ্ন থাকে বিয়ের বয়স হওয়ার পর তাদের বিয়ে হবে ইংল্যান্ড, আমেরিকানস্থ বাঙালি ছেলেমেয়ের সঙ্গে। আমার কয়েছভাই তো মজা করে বলেন, যেভাবে সবাই ইংল্যান্ড, আমেরিকার পাত্রপাত্রীর দিকে ঝুকে পড়েছে, শেষে দেখবি আমরা বাংলাদেশি বেকার ছেলে ও কালো মেয়েরা বিয়ের জন্য মানানসই পাত্রপাত্রী খুজে পাবো না। কারণ একটু ফর্শা হলেই ছেলেমেয়ে স্বপ্ন দেখে তার বিয়ে হবে কোনো প্রবাসীর সঙ্গে।

কয়েছভাইয়ের কথা উড়িয়ে দিতে পারি না। কারণ কয়েছভাই বাস্তববাদী মানুষ। ইংল্যান্ডে এসে এই কয়েকদিনে দেখেছি এখানে বসবাসরত বাঙালি ছেলেমেয়েরা এ দেশে বসবাসরত বাঙালি ছেলেমেয়েকে বিয়ে করতে চায় না। তারা বিয়ে করার জন্য বাংলাদেশে যায় এবং ছেলেরা মামাতো, চাচাতো, ফুপাতো, খালাতো বোন এবং মেয়ের মামাতো, চাচাতো, ফুপাতো, খালাতো ভাই বিয়ে করে। পরিবারের কর্তারা পাত্রপাত্রী ঠিক করেন। পাত্রপাত্রী বিয়ে করে প্রবাসে নিয়ে আসে।

আমার বিয়ের পর আমার স্বামী ইংল্যান্ড চলে এসেছিলেন আমাকে ইংল্যান্ড নিয়ে আসার কাগজপত্র তৈরি করার জন্য। এক সময় কাগজপত্র ঠিক করে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। আমি ঢাকাস্থ বৃটিশ এমবাসিতে গিয়ে ইংল্যান্ডে আসার ভিসা পেয়েছিলাম।

আমার স্বামী তাজুল ২০০৪–এর জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য আমরা স্বামী–স্ত্রী এক সঙ্গে ইংল্যান্ডে আসবো।

তাজুল জানেন, আমি নৌকা চড়তে খুব পছন্দ করি। তিনি সাতার জানেন না। তাপরও আমি নৌকা চড়তে খুব পছন্দ করি বলে তিনি বাংলাদেশে আসার পর আমাদের বাড়ি থেকে ত্রিশ পয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে শেরপুরে নিয়ে যেতেন। সেখানে কুশিয়ারা নদী আছে। আগে সে নদীতে ফেরি ছিল। কয়েক বছর হলো বৃজ হয়েছে।

তাজুল সাদীপুর বৃজের নিচে ঘাটে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জিনওয়ালা নৌকা ভাড়া করতেন। আমরা দুজন নৌকায় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেড়াতাম। উদ্দেশ্য বিহীন যাত্রা। নৌকা সোজা চলতে থাকতো। ঘণ্টা দুয়েক বা তিনেক যাওয়ার পর মাঝিকে নৌকা ঘুরিয়ে ঘাটে চলে যাবার জন্য বলতাম।

২০০৪–এর ফেব্রুয়ারির প্রথম বৃহস্পতিবার থেকে এপৃল–এর শেষ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমরা দুজন নৌকা করে সে নদীপথে অনেক ঘুরে বেরিয়েছি।

তাজুল বলেছিলেন, ইংল্যান্ডে আসার পর তিনি আমাকে নিয়ে নৌকায় করে ঘুরে বেড়াবেন। তবে ইংল্যান্ডে যেহেতু খরচ একটু বেশি পড়বে সে জন্য শুধু প্রত্যেক মাসের শেষ বৃহস্পতিবার নৌকা ভাড়া করে এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াবো।

আমার বাবা মায়ের দোয়া ছিল। তাই এ রকম স্বামী পেয়েছি। ইংল্যান্ডে এসে দেখেছি বাংলাদেশ থেকে আসা বেশির ভাগ স্ত্রীরা এ দেশের বাতাস খেয়ে অন্য রকম হয়ে যায়।

আমার স্বামী দেশে থাকতে নৌকায় ওঠার পর ইংল্যান্ডের একটি ঘটনা বলেছিলেন।

ইংল্যান্ডে তাদের রোডে এক ছেলে থাকতো। রোডের একেবারে শেষের মাথায় বাসা। ছেলেটি কিছুটা বোকা প্রকৃতির ছিল। ছেলেটির মা তাকে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে তার খালাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে করিয়েছিলেন। সে মেয়ে বিয়ের পর স্বামী, শাশুড়ির সঙ্গে সুন্দর সুন্দর কথা বলতো। সে বলতো, বোকা হোক আর যাই হোক, আল্লাহ আমার কপালে যে স্বামী দিয়েছে তাকে মাথায় করে রাখবো।

সে মেয়েটিকে স্বামী ছয় মাসের ভেতর বাংলাদেশ থেকে ইংল্যান্ড নিয়ে এলো। ইংল্যান্ড আসার পর এক সময় সে মেয়েটি লিগ্যাল হলো। লিগ্যাল হওয়ার এক মাস পর সে মেয়েটি স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে একটি নিগ্রো ছেলেকে বিয়ে করলো। ছেলেটির মা ছেলেটিকে বাংলাদেশ নিয়ে গিয়ে আবার বিয়ে করিয়েছেন। কিন্তু ঠিক করেছেন এই বৌকে আর ইংল্যান্ড এনে ইংল্যান্ডের বাতাস গায়ে মাখতে দেবেন না।

কার্ডিফ, ওয়েলস থেকে

দিমমি আগুরি সিমোনা

- পলাশ রহমান শান্ত

লঞ্চটা ছুটছে। তিরতির করে ছুটছে শান্ত জলের বুক চিরে। দুই পাশে শাদা ফেনার মতো জল বড় ঢেউ তুলে হারিয়ে যাচ্ছে দূরে। বহু দূরে, কয়েকটা পানকৌড়ি ডিমে তা দেয়ার ঢঙে সেই ঢেউয়ের তালে দোল খাচ্ছে আপন মনে। এক সময় ওরা চলে যাচ্ছে দৃষ্টির আড়ালে আবার উড়ে আসছে। ঢেউ যাচ্ছে। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দ হচ্ছে চারপাশে। বিজলীর মতো আলো ঝরছে সেই ক্লিক থেকে। ডয়েশ, ইংলিশ, ইটালিয়ান, পর্তুগিজ, ফ্রেঞ্চসহ বারো ভাষার কিচিরমিচির চলছে হরদম। থই থই ভালো লাগা আর যাত্রীদের আনন্দ উত্তেজনা নদীটার বাকে বাকে যেন নতুন মাত্রা পাচ্ছে।

আমি দিশেহারা নয়নে দেখছি। পুলকিত হচ্ছি। সেই ছোট বেলায় কোনো এক গল্পে পড়েছিলাম, পৃথিবীর একমাত্র ভাসমান শহর ভেনিস। দূর থেকে দেখলে মনে হবে বড় সব দালান ভেসে আছে একটা কলার

ভেলায়–আাকা–বাকা নদী ,ছোট–বড় অসংখ্য নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে সাগরে। রাতে ঝলমলে নিয়ন বাতির মোড়কে ভেসিনকে ঠিক একটা *জলপরী* বলে ভুল হতে পারে। আজ সেই স্বপ্নের শহরে ভাসছি একঝাক নানান বর্ণ ও ভাষার ভ্রমণ বিলাসীদের সঙ্গে যা কখনো নিজের মায়ের দেশে ভাবতেও পারিনি। কি যে আনন্দ! অদ্ভুত মাদকতা। উফ!

হঠাৎ আমার কাধে একটা মৃদু ঝাকি অনুভব করলাম। চমকে চোখ ফিরিয়ে দেখি এক সদ্য তরুণী। বড্ড মিষ্টি চেহারা। মাথায় সোনালি চুলগুলো বাতাসে উড়ছে ফুরফুর। চোখ–মুখে উপচে পড়ছে উচ্ছ্বাস আর উল্লাসের ঝরনা।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে বললো, দিম মি আগুরি, আগুরি সিমোনা।

বেশ কৌতূহলী হয়ে বললাম, কেন?

আবারও সেই একই কথা, দিম মি মি মি আগুরি পেরপিয়সেরে।

কিন্তু কেন? কেন আমি তোমাকে শুভেচ্ছা দেবো!

চারপাশে সিমোনার সমবয়সীদের খলখলে হাসিতে নির্বোধ আমি বিদ্ধ হচ্ছি। ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত হচ্ছি। সবাই চেয়ে আছে আমার দিকে। কেউ কেউ ক্যামেরা ক্লিক করছে।

সিমোনা আমাকে ধরে বার বার অনুরোধ করছে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে।

অথচ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বড্ড অবাক হচ্ছি। এমন তো কখনো দেখিনি। নিজেকে বড় আনাড়ি মনে হচ্ছে। ইচ্ছা করছে পানিতে ঝাপ দিই। তাও সম্ভব না।

সিমোনা আমাকে ধরে রেখেছে।

এমন সময় হাসির মাঝ থেকে ভেসে এলো একটা কণ্ঠ। আজ সিমোনার ১৮তম জন্মদিন। আমরা সবাই তাকে শুভেচ্ছা দিয়েছি। তুমিও দাও।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো উচ্চারণ করলাম, আগুরি, তানতি আগুরি সিমোনা।

সিমোনা আমার গালে গাল ছোয়ালো। তার চোখ–মুখ প্লাবিত হলো এক অমীয় উচ্ছ্বাসে যেন পৃথিবীর সকল সুখ আজ তার জন্য শুধু তার যা এতোক্ষণ পূর্ণতা পাচ্ছিল না আমার জন্য।

ইওরোপিয়ান তরুণ–তরুণীরা সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয় যখন তাদের বয়স আঠারো ছুই ছুই। কারণ ইওরোপের আঠারো বছর মানে এক অন্য জীবন। সব ধরনের শাসন–বারণের উর্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবন। যে জীবনের জন্য তারা অপেক্ষা করে ১৭টি বছর।

আজও প্রায় প্রতিদিন নৌযানে চড়ি আর চড়লেই অজান্তে সিমোনাকে ভাবি। ঢেউয়ের ভিড়ে তার মতো আনন্দ খুজি। সতেরো পেরিয়েছি অনেক আগে। কিন্তু সিমোনার আনন্দ ছুয়ে দেখিনি।

লিজে ডি জেসোলো, ইটালি থেকে
palashrahman@libero.it

খুনির সহযোগী

দেলওয়ার হোসাইন

বাংলার বারো ভূইয়াদের একটি পরগনা, নাম বিক্রমপুর। বৃটিশ আমল থেকেই এটির দাফতরিক নাম মুন্সিগঞ্জ। এটি একটি দ্বীপ জেলা। একেবারে সন্দ্বীপের মতো। চতুর্দিকে নদী। উত্তরে ধলেশ্বরী, পূর্বে মেঘনা, দক্ষিণে মেঘনা–পদ্মার সঙ্গম স্থল, পশ্চিমে পদ্মা।

একটি মাত্র রাস্তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা মুন্সিগঞ্জ শহরের উত্তরের শেষ প্রান্তে মুন্সিগঞ্জ গুদারাঘাট। বর্তমানে দীর্ঘ পঞ্চাশ ষাট বছরের, তা ধলেশ্বরীর ভাঙনে কয়েক মাইল ভেতরে এসে হয়েছে লঞ্চঘাট। গুদারাঘাট থেকে মাইল দুয়েক দক্ষিণে এগোলে প্রথম নজরে পড়বে বরফ কল ও পানির কলের ধ্বংসাবশেষ এই স্থাপনা থেকে কোনো একদিন সারা মুন্সিগঞ্জে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হতো। তারপর শহরতলির গোয়ালপাড়া, শ্রীপল্লির হিন্দু পরিবারের পরিত্যক্ত বা স্বল্প জনবসতির মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের বাড়ি। এরপর রাস্তার পূর্ব পাশের পুকুরের পশ্চিম পাড়ে থানা ও থানা সংলগ্ন রাস্তার পাশের পুকুরের পূর্ব পাড়ে জগদ্ধাত্রীর মন্দির ও বিশাল পূজামণ্ডপ এবং পশ্চিমে কালিবাড়ি। কালিবাড়ির বিপরীতে শহরের একমাত্র সিনেমা হল *ছবিঘর*। তারপর দুই দিকে গায়ে গায়ে লাগানো দোকানপাট চলে গেছে জেলার কোর্ট–কাছারি পর্যন্ত। শহর শেষ।

গুদারাঘাটের শেষ প্রান্তে যেখান থেকে খেয়া নৌকায় পার হতে হয়, একটি নাতি খাল নদী সদৃশ্য ধলেশ্বরীর শাখা দক্ষিণ পাশ দিয়ে মুন্সিগঞ্জ শহরের রাস্তার সমান্তরালে বয়ে গেছে খাল। নাম *মুন্সিগঞ্জ জুবিলি খাল*। এটি কৃত্রিম খাল। ১৯১১ কি ১২ সালে খনন করা হয় মহারানী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন লাভের জুবিলি উৎসব উপলক্ষে। একশ শোয়াশ ফিট চূড়া, বিশ পচিশ ফিট গভীর হলেও বর্ষাকালে কানায় কানায় ভর্তি এটি একটি ছোট নদী। শহরের মাঝখান দিয়ে এটি দক্ষিণে গিয়ে মিশেছে কাটাখালির প্রশস্ত খালে। বর্ষাকালে মুন্সিগঞ্জ খালের বুকের ওপর দিয়ে চলাচল করে অসংখ্য নৌকা। *কোষা, কেরায়া, ডিঙি ও গয়না নৌকা।* কখনো বা জেলা অফিসারা স্পিডবোট। কালে–ভদ্রে ছোট আকৃতির দুই একটি লঞ্চও অতিক্রম করে। রাত দিন খালের পাড়ের বাড়িগুলো সরগরম হয়ে ওঠে নৌকার কোলাহলে।

কোর্ট–কাছারির বিপরীত দিকে খালের পূর্ব পাশটি মাঠপাড়া। তারপর খালের পাড় ধরে পাশাপাশি বাড়ির সারি শেষ হয়েছে মোল্লাবাড়ির শেষ সীমায়। এটি মাঠপাড়ার গরিব এলাকা, চাষীদের বাড়িঘর। তারপর বিস্তীর্ণ শষ্যক্ষেত। বর্ষাকালে এ শস্যক্ষেত ডুবে যায় কোথাও এক মানুষ, কোথাও দেড় মানুষ সমান পানিতে।

বর্ষাকালে আমাদের একমাত্র ভরসা নৌকা। শুধু বাড়ি থেকে খাল পার হয়ে পশ্চিম তীর ধরে শহরের প্রধান রাস্তায় ওঠা নয়, প্রতিপদে লাগে নৌকা। নৌকায় ক্ষেত–খামার পরিচর্যা, শস্য কেটে ঘরে তোলা, দূরে আত্মীয় বাড়ি যাওয়া, বাড়ির বৌ–বেটির নাইওর আনা–নেয়া, এমনকি বর্ষার বিয়ের বরযাত্রীও যায় নৌকার বহরে।

১৯৫৩ সাল। ক্লাস এইটে পড়ি। গ্রামের ছেলে আমিসহ বন্ধুরা এক একজন বিয়ের লায়েক। সারা গায়ে (দশ ঘরের গা) আমরা তিনজন এক ক্লাসের, বাকিরা ছোট। লেখাপড়া জানা বড়রা ম্যাট্রিক পাস করে ঢাকায় বা অন্যত্র চাকরি করছে। পড়া না জানারা অনেক আগে থেকেই চাষবাষে লেগে গেছে। তখনকার দিনে সমবয়স্ক আপন চাচাতো, পাড়াতো, চাচাতো, মামাতো বোনরা সব শ্বশুর বাড়ি উজালা করছে। একেকজন তিন চার সন্তানের গর্বিত মা। যুৎসই ভাবীও পাওয়া যেতো না তখন। বাধ্য হয়ে ছেলে বন্ধুরাই একে অপরের সুখ–দুঃখের ভাগিদার।

চিনু যার বিয়ে খেতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছিলাম তিনি ছিলেন আমাদের তিন চার বছরের বড়। তিনি ছিলেন মেয়েদের নানান শারীরিক ব্যাপারে–স্যাপারের শিক্ষাগুরু। কারো মুরগি, হাস, এমনকি কারো মোটা–তাজা খাসির চুরি করে মাংস খাওয়া, গাছের ফল, ক্ষেতের আখ ইত্যাদি চুরির কাজ আমরা একত্রেই করি। আসল কাজগুলো চিনু ও সুলতান করতেন। আমি তাদের সঙ্গ দিতাম। কিন্তু বাড়তি চোরাই মালের ভাগ পেতাম সমানই।

এক বর্ষায় চিনু প্রস্তাব করলেন, চল, আমরা নৌকা বেয়ে যাবো গল্প, গান, আনন্দ করতে করতে। অনেক উপভোগ করা যাবে। রাতেই ফিরে আসবো। নাশতা, খাবার ও ফুর্তির সব ব্যবস্থা সেই করবে।

নির্দিষ্ট দিনে হঠাৎ সরদারপাড়ার চিনুর দুই বন্ধু এসে হাজির। ভাবলাম চিনুই এ রোমান্টিক নৌকা ভ্রমণের জন্য তাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। সুতরাং আমার ও সুলতানের কোনো আপত্তি ছিল না।

যথাসময়ে নৌকা ছাড়া হলো। ভাটির টানে আমরা দুজন দুজন করে বৈঠা মেরে বিকেলের পড়ন্ত রোদে বাড়ি থেকে পাচ সাত মাইল দূরে কাটাখালি খালের পূর্ব প্রান্তে পৌছালাম। সন্ধ্যার কিছু আগে আমরা নাশতা খেলাম। আমাদের আশপাশ দিয়ে মাঝে মধ্যে দুই একটি নৌকা চলে যাচ্ছে।

এক সময় সন্ধ্যার আধঘণ্টা পর তারা চারজন আমাকে একটি ছাড়া পরিত্যক্ত ভিটায় বসতে বলে নদীর তীরের একটি পাট ক্ষেতে গিয়ে ঢুকলো। তারা আমার দৃষ্টির বাইরে। অনেকক্ষণ তাদের কোনো সারা শব্দ নেই। তারা ছিল খুব দুঃসাহসী। অনেক সময় অনেক জিনিস চুরি করতো অপ্রয়োজনীয় পরিমাণ। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জিনিস চুরি আমাকে ভয় ও বিবেকের দংশনে কাবু করতো। তবু দুই বন্ধুর সান্নিধ্য হারানোর ভয়ে তাদের সব কাজের সঙ্গী হতাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পর তারা ফিরে এলো। দেখি চিনুর বন্ধুদের একজন নেই।

তার কথা জিজ্ঞাসা করতে তারা বললেন, নৌকার তলায় ফেলে বিশ মিনিট ধরে রাখতে হয়েছে। তবু শালা সাবাড় হয় না।

আমাকে নৌকায় তুলে তারা আনন্দে আত্মহারা।

আমি বোবা হয়ে থাকলাম।

বাড়ি এসে আল্লাহ আল্লাহ করতে লাগলাম। বোধহয় আল্লাহ আমার কথা শুনেছেন, সঙ্গে তাদের কথাও। সেই ঘটনা আমরা যেমন ভুলে গেছি, তেমনি লাশের হদিশও কেউ পায়নি।

ভয়ে চিনুর ওই বন্ধুর নাম জানতে চাইনি। অপর বন্ধুকে দেখেছি বহুবার। নির্বিকার। অতি ভালো মানুষ।

কিন্তু আমার নিজেকে এখনো মনে হয় খুনির সহযোগী। ওই সময়ে এমন দুঃসাহসী ঘটনা, বিলিভ ইট অর নট-এর মতোই অবিশ্বাস্য ছিল।

ঢাকা থেকে

রাতের ছবি দেখার পর

- শাহরিয়ার চৌধুরী

১৯৯৬ সাল। সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে সেকেন্ড ইয়ারে পড়তাম। আমাদের সুরমা নদীর দুই পারের যোগাযোগের ব্যবস্থা হিসেবে নদীতে দুইটি বৃজ ছাড়া বেশ কয়েকটি খেয়াঘাট ছিল। এর মাধ্যমে মাঝিরা নৌকা দিয়ে যাত্রী পারাপার করতো। ভোর ছয়টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত ঘাটে মাঝি থাকতো।

একদিন আমরা তিন বন্ধু মিলে সিনেমা হল থেকে সিনেমা দেখে ছাত্রাবাসে ফিরছি। খেয়াঘাটে আসতে রাত একটার মতো বেজে গেল। পরিচিত সব মাঝির নাম ধরে অনেক ডাকাডাকি করলাম। কিন্তু কারো কোনো সাড়া-শব্দ নেই। এদিকে রাত অনেক বেড়ে গেছে। পাছে টহল পুলিশের নজরে পড়লে তো রক্ষা নেই। তারা তো আবার... অতন্দ্র প্রহরী। সব আশা যখন শেষ, ঠিক হলো যেভাবেই হোক নৌকা দিয়ে নদী পার হতেই হবে।

যেই ভাবা সেই কাজ। একটি নৌকার তালা ভেঙে শুরু করলাম আমাদের নৌযাত্রা। তখন ছিল নদীর পূর্ণ যৌবনা। ফলে যা হবার তা-ই হলো। ঠিক ভরা গাংয়ের মাঝখানে এসে ঘটলো বিপত্তি। প্রচণ্ড পানির স্রোতে নৌকা আমাদের গন্তব্য থেকে প্রায় তিন চার কিলোমিটার ভাটির দিকে পিছিয়ে গেল। কোনো অবস্থাতেই আমাদের নৌকাটি নদীর কোনো পাড়েই ভেড়ানো যাচ্ছিল না। এদিকে আমরা একেবারে টুকেরবাজার ঘাট অতিক্রম করে চলেছি। রাতও প্রায় শেষ হওয়ার পথে।

হঠাৎ একটি মাছ ধরার নৌকার বৃদ্ধ মাঝি আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে ছুটে এলেন সাহায্যের জন্য। অনেক কষ্টে ভোরের শেষ দিকে অর্থাৎ সুবেহ সাদেকের সময় বৃদ্ধ মাঝির সহায়তায় আমরা ক্যাম্পাসে ফিরে গেলাম। সেদিন থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর কোনোদিনও রাতে সিনেমা দেখতে যাবো না।

বড়লেখা, মৌলভীবাজার থেকে
chowdhuryshaheen2002@yahoo.com

উপেক্ষিত সন্দ্বীপ

- কাজী নাজমুল করিম মনসুর

২০০২ সালের মধ্য আগস্টে এক তদন্ত কাজে সন্দ্বীপে যাওয়ার অফিস আদেশ পেলাম। এই আদেশ পাওয়ার পর মনের মধ্যে এক নতুন আনন্দানুভূতি জেগে উঠলো। এর আগে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহুবার লঞ্চ ও নৌকায় ভ্রমণ করেছি। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে সমুদ্রযাত্রার এটাই ছিল প্রথম অভিজ্ঞতা।

নির্দিষ্ট দিনের আগের রাতে পাশের বাসার সীমাআপা থেকে বাইনোকুলারটি ধার নিলাম। কিছু বই, ম্যাগাজিন আর কাপড়-চোপড় ভর্তি একটি ব্যাগ নিলাম।

পরদিন সকালে নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগে চট্টগ্রাম সদরঘাট টার্মিনালে এসে পৌছালাম। সহযাত্রী কর্মকর্তাটি ক্যাবিন ভাড়া নেয়ার প্রস্তাব দিলেন।

রাজি হলাম না তার প্রস্তাবে। কারণ ক্যাবিন মানে একটি বদ্ধ খাচায় আবদ্ধ থাকলে সমুদ্রের বিশালত্ব আর অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবো না। ফলে সমুদ্রযাত্রাটিই বৃথা হয়ে যাবে।

অবশেষে *এমভি মনিরুল হক* জাহাজের ডেক শ্রেণীর টিকেট কাটা হলো। বলে রাখা ভালো যে, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে চলন্ত ট্যাংকের সামনে বুকে ডিনামাইট বেধে যে কয়েকজন বীর বাঙালি সৈন্য শুয়ে পড়ে আত্মাহুতির মাধ্যমে ইনডিয়ান বাহিনীর লাহোর জয় করে চা খাওয়া স্বাদ চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছিল তাদের কয়েকজনের নামে বিআইডাবলিউটিসি-র কয়েকটি জাহাজ রয়েছে যেগুলো চট্টগ্রাম থেকে সন্দ্বীপ, হাতিয়া-কুতুবদিয়াসহ দেশের বিভিন্ন উপকূলীয় দ্বীপ অঞ্চলে যাতায়াত করে। এই জাহাজগুলো বয়স ও নিয়মিত মেরামতের অভাবে কারণে চলন ক্ষমতা কমে এসেছে। প্রায়ই মাঝ দরিয়ায় বিকল হয়ে যায়। তবুও এ সমস্ত জাহাজ ছাড়া দ্বীপবাসীদের যাতায়াতের কোনো বিকল্প নেই।

টার্মিনাল থেকে সরাসরি জাহাজের গুলুইতে এসে বসলাম। নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ ছাড়লো। মৃদুমন্দ বাতাসে প্রায় এক ঘণ্টা কর্ণফুলি নদী দিয়ে চলে জাহাজ। যখন বঙ্গোপাসগরের মোহনায় (স্থানীয় ভাষায় খাড়ি) এলো তখন বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে লাগলাম চারপাশ। যতোদূর দেখা যায় শুধু পানি আর পানি। ছোট ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে। ক্রমেই জাহাজটি সমুদ্রের গভীর থেকে আরো গভীরে এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে দুই একটি সওদাগরি জাহাজ আর মাছ ধরা ট্রলার ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জানতে পারলাম জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও নাকি ১৯২৯ সালে সন্দ্বীপ যাওয়ার সময় এই বঙ্গোপাসগরের বিশালত্ব ও অপরূপ সৌন্দর্য দেখে রচনা করেছিলেন তার বিখ্যাত কবিতা *হে সিন্ধু, হে বন্ধু, হে মোর চিরবিরহী।*

এভাবে সাগরের বুকে ভাসতে ভাসতে এক সময় বাইনোকুলারের চোখে ধরা পড়লো কিছু গাছপালা আর মাটি। জাহাজ যতোই এগিয়ে যাচ্ছে ততোই তা আরো পরিষ্কার হতে লাগলো। বুঝতে বাকি রইলো না এটাই সেই সন্দ্বীপ।

আরো আধা ঘণ্টা পর পৌছালাম সন্দ্বীপ ঘাটে। মনে মনে যে সন্দ্বীপ কল্পনা করেছিলাম তার কোনো কিছুই দেখতে পেলাম না। অর্থাৎ ছোটখাটো একটা শহরের কিছু বৈশিষ্ট এখানে থাকবে। কিন্তু জাহাজ যেখানে নোঙ্গর করলো সেটা যেন একটা নতুন জেগে ওঠা কোনো চর বলে মনে হলো।

আমাদের জাহাজটি তীর থেকে প্রায় একশ ফিট দূরে নোঙ্গর করলো। এই স্থানটুকু দেশি সাম্পানে উঠে পার হতে হবে। একটি দেশি সাম্পান এসে জাহাজের সঙ্গে ভিড়লো। জাহাজ থেকে নামানো হলো প্রায় পনেরো ফিট লম্বা একটি সিড়ি যার এক প্রান্ত একেবারে সাম্পানের মাঝে স্থাপন করা হলো। হাতল হিসেবে লাগানো হলো একটা মোটা রশি। সমুদ্রের ঢেউ জাহাজকে নাড়াতে পারলো না। ক্ষুদ্র সাম্পানটি ঢেউয়ের দোলায় একবার পনেরো থেকে বিশ ফিট উপরে উঠা-নামা করছে। কখনো মনে হয় একেবারে কাত হয়ে বুঝি ডুবে যাচ্ছে। এরই মাঝে যাত্রীরা নামছে সাম্পানে।

নতুন হিসেবে মনে ভয় নিয়ে দোয়া-দরুদ পড়ে আমি সাম্পানে নামলাম। আমার পেছনে একটি মেয়ে তার দাদিকে হাত ধরে নামচ্ছে। কিন্তু বুঝে ওঠার আগেই এক প্রচণ্ড ধাক্কায় মেয়েটির দাদি সাম্পানের একেবারে মাঝে এসে পড়লেন। মেয়েটি হাত ফসকে পড়ে গেল সাম্পানের সঙ্গে আঘাত লেগে একেবারে সমুদ্রে। সাগরের নোনা জল মানুষের রক্তে লাল হয়ে গেল।

তীরে আর জাহাজে চিৎকার-চেচামেচি শুরু হয়ে গেল। কান্নার রোল উঠলো তার স্বজনদের মাঝে। এরই মধ্যে তীর থেকে দুঃসাহসী কয়েকজন লোক সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ে মেয়েটিকে মৃত প্রায় অবস্থায় উদ্ধার করলো। দেখলাম তার মুখের ডান অংশে বেশির ভাগ কেটে গিয়েছে এবং কয়েকটি দাত ভেঙে গিয়েছে।

যে আনন্দ নিয়ে সমুদ্রযাত্রা শুরু করেছিলাম, এই দৃশ্য দেখার পর মুহূর্তের মধ্যে সেখানে দেখা দিল দুঃখ বোধ। তারপর যে কয়েকদিন সন্দ্বীপে ছিলাম, স্বাভাবিক থাকতে পারিনি। আজো যখন কোনো সমুদ্র বা নৌযাত্রার প্রসঙ্গ আসে, মনের মাঝে ভেসে ওঠে সেই দুঃখজনক ঘটনাটি। জানি না শেষ পর্যন্ত মেয়েটির ভাগ্যে কি ঘটেছিল। আজো সে বেচে আছে কি না?

আমার ভাবতে অবাক লাগে, এই একবিংশ শতাব্দীতে যেখানে মানুষ গ্রহ ও গ্রহান্তরে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে ছুটে বেড়াচ্ছে সেখানে একটি স্থায়ী জেটি বা পল্টুনের অভাবে দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসীদেরকে কাদাপানিতে একাকার হয়ে জীবনের ঝুকি নিয়ে জাহাজে উঠা-নামা করতে হয়। প্রতি বছর সরকারি কোষাগারে এই সমস্ত দ্বীপবাসীরাও অনেক টাকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর জমা দিচ্ছে। একটি স্থায়ী জেটি নির্মাণ করতে কতোই বা খরচ হবে! দ্বীপবাসী জনগণ এই দাবিটুকু নিশ্চয়ই সরকারের কাছে করতে পারে। এবং সেটা করলে কি খুব বেশি হবে দ্বীপবাসী জনগণের?

শেরশাহ কলোনি, চট্টগ্রাম থেকে

কুড়ানো মানিক

- এস. জাহাঙ্গীর চৌধুরী

১৯৮৮ সালের কথা। দেশব্যাপী বন্যার প্রলয়ংকরী তাণ্ডব দেখা দিল। আমার সবেমাত্র যৌবনের শুরু। কবির ভাষায়, এখন *যৌবন যার...*। নেমে পড়লাম মানব সেবায়। ত্রাণকর্মী হিসেবে চলে গেলাম সুনামগঞ্জের হাওরবর্তী এলাকায় জরুরি ত্রাণ কাজে।

আমরা ছয়জনের ক্যাম্প করলাম। প্রতিদিন বানবাসী মানুষকে রিলিফের খাদ্য, পানি, বিস্কিটসহ জরুরি ওষুধ সামগ্রী পৌছে দিচ্ছি।

একদিন স্পিডবোট করে আমাদের দল ছুটে চলেছে। কিছু দূর যাবার পর দেখতে পেলাম একটি ভেলার মধ্যে বানের পানিতে ভেসে আসছে একটি মানব শিশু। তীব্র আর্তচিৎকার তার। কাছে এসে প্রথমে আমিই তাকে কোলে তুলে নিলাম পরম মমতায়।

একটি আশ্রয় পেয়ে সেও যেন হাপ ছেড়ে বাচলো।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, শিশুটি আমার কোল ছেড়ে আর কারো কোলে যাচ্ছে না। ফলে আমাকেই তার সেবা শুশ্রূষা করতে হলো।

এভাবে ধীরে ধীরে তার প্রতি আমার ভালোবাসা গভীর থেকে আরো গভীরতর হতে থাকলো। একদিন তাকে নিয়েই বাড়ি ফিরলাম। বাড়ির সবাই তাকে পেয়ে মহাখুশি।

সেই থেকে আজও সে আমার নিজ সন্তানের মতো। যদিও এখনো পর্যন্ত আমি...!

যাহোক, এখন সে নিয়মিত স্কুলে যায় আর আমাকে *বাবা* বলে ডাকে। সে এক অমর অনুভূতি। ভালোবাসা দীর্ঘজীবী হোক।

বড়লেখা, মৌলভীবাজার থেকে
an_unfinished_life@hotmail.com

নিমন্ত্রিত অতিথি

- কামরুন নাহার টগর

আমার আব্বা আর মেজ খালুর মধ্যে ছিল বংশ আর আভিজাত্যের দ্বন্দ্ব। আমার আব্বাই বংশ এবং শিক্ষার বেশি দম্ভ দেখাতেন মেজখালুর সঙ্গে। তাই মেজখালু আব্বাকে এড়িয়ে চলতেন।

এর মধ্যে মেজখালুর বড় মেয়ে অর্থাৎ আমার বড় খালাতো বোনের বিয়ে ঠিক হলো। মেজখালু আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ দিতে এলেন। আব্বা ওই দিন বাড়ি ছিলেন না। মুন্সিগঞ্জ গেছেন তার পেনশনের টাকা তুলতে। মেজখালু ছিলেন ব্যবসায়ী মানুষ। একদিকে দোকান, অন্যদিকে মেয়ের বিয়ের কাজকর্ম তাকে খুব সময় হিসাব করে করতে হচ্ছে। তাই আব্বার আসতে দেরি হবে শুনে মায়ের কাছেই খালু নিমন্ত্রণ দিয়ে চলে গেলেন।

সন্ধ্যায় আব্বা বাড়ি ফিরে নিমন্ত্রণের কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। মাকে স্রেফ জানিয়ে দিলেন, ওই দোকানদারের মেয়ের বিয়েতে আমি তো যাবোই না, তোমরাও যেতে পারবে না। কারণ সে আমার কাছে নিমন্ত্রণ দেয়নি। আরো বললেন, আমি দারোগার ছেলে, কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেছি। ওই দুই পয়সার দোকানদারের মেয়ের বিয়েতে আমাকে নিতে হলে আমার জন্য হাতি পাঠাতে হবে।

আব্বা দারোগার ছেলে, কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে খুব গৌরব করতেন। এ জন্য আড়ালে-আবডালে লোকে আব্বাকে টিজ করতো। এমনকি আমাকেও তারা বলতো, কি রে দারোগার নাতনি, কলকাতা যাবি না পড়তে?

তখন আব্বার ওপর খুব রাগ হতো। অবশ্য আব্বা আমাকে অনেক আদর করতেন। কারণ আমি ছিলাম তার একমাত্র মেয়ে। এতো আদরের পরও আব্বাকে খুব ভয় পেতাম। বিয়েতে যেতে পারবো না শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আব্বার যেই কথা সেই কাজ।

বিয়ের দিন ক্রমেই ঘনিয়ে আসতে লাগলো। সমবয়সী আমার অন্যান্য মামাতো, খালাতো ভাইবোনেরা বিয়েতে যাবার জন্য সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি নির্বিকার। আমার মামিরা মাকে এবং আমাকে বিয়েতে যাবার অনুমতির জন্য বার বার আব্বার কাছে আবেদন করে ধমক খেয়ে ফিরে এলেন। অবশেষে কি যেন কি ভেবে মামিদের সঙ্গে বিয়েতে যাবার জন্য মাকে অনুমতি দিলেন আব্বা। তবে আমাকে যেতে দেবেন না। শুনে আমি তো কেঁদেই খুন। মাও আমাকে ছাড়া যাবেন না।

আমাকে যেতে না দেবার কারণ হিসেবে আব্বা জানালেন, এক নৌকায় এতোগুলো লোক যাবে, নৌকা ডুবে গেলে আমার মেয়ে মরে যাবে। তোমরা যাও। বিয়ের দিন সকালে একটি নৌকা আর তার ছোট মামাকে পাঠিও টগরকে নেয়ার জন্য। এটাই হলো শেষ সমাধান।

পরদিন সবাই নৌকায় করে বিয়েতে চলে গেল। আমি ঘরে শুয়ে শুয়ে কাদছি। আব্বা আমাকে ঘাটে ডেকে নিয়ে দেখালেন। দেখেছিস নৌকার কি ডুবুডুবু অবস্থা?

আব্বা সাতার জানতেন না বলে এক নৌকায় বেশি মানুষ উঠলে আব্বার খুব ভয় হতো। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছি আগামীকাল বিয়েতে যাবো। কতো মজা করবো। আজ যেতে না পারার জন্য আব্বার চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছি।

পরের দিন অর্থাৎ বিয়ের দিন সকাল নয়টার সময় আব্বা বললেন, কি রে, তোকে তো নিতে নৌকা পাঠালো না? দেখেছিস তোর খালু কতো বজ্জাত। বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

ঘণ্টা খানেক পরে আব্বা বড় একটি ছইওয়ালা নৌকা নিয়ে এসে বললেন, শিগগির তৈরি হয়ে নে, বিয়েতে যাবি।

জানতে চাইলাম, কার সঙ্গে যাবো?

আব্বা বললেন, কেন! আমার সঙ্গে।

আব্বা বিয়েতে যাবেন শুনে খুশিতে আমার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

তিনি একাই বলতে লাগলেন, আমারও একটা মেয়ে আছে। আমার মেয়ের বিয়েতে ওই শালা দোকানদারকে (মেজ খালুকে) আমি নিমন্ত্রণ করবো না। এর প্রতিশোধ নেবো।

তৈরি হয়ে আব্বা আর আমি ছইওয়ালা নৌকায় চড়ে রওনা দিলাম। ছোট নদীর ওপর দিয়ে আমাদের নৌকাটি তরতর করে চলছিল। মাঝে মধ্যে ইঞ্জিনচালিত ট্রলার আমাদের নৌকার পাশ দিয়ে যাওয়াতে ঢেউয়ের তোড়ে আমাদের নৌকাটি মনে হচ্ছিল একবার পাহাড়ে উঠছে এবং নামছে।

আমি ভয় পেলে আব্বা আমাকে তার বুকে টেনে নিয়ে বলেন, ভয় পাসনে, কিচ্ছু হবে না।

এক সময় নৌকাটি মাঝ নদীতে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর বড় একটি মাল ভর্তি ট্রলার খুব দ্রুতগতিতে আমাদের নৌকার মুখোমুখি আসছিল।

আব্বা আমাদের মাঝিকে বললেন ট্রলার থেকে দূরত্বে চালাতে।

মাঝি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই ট্রলারটি আমাদের নৌকাকে ধাক্কা দেয়। মুহূর্তে আমাদের নৌকাটি তলিয়ে যায় নদী গর্ভে। যদিও আমি সাতার জানি তবুও ছোট ভেবে মাঝি আমাকেই কাধে তুলে নেয়। ভয়ে আমার জ্ঞান হারা অবস্থা। পাড়ে এসে আব্বার কথা মনে হয়েছে। চিৎকার দিয়ে উঠি, আমার আব্বা কোথায়? কোথাও আব্বাকে দেখা যাচ্ছে না। আশপাশের গ্রামের মানুষ জাল ফেলে আব্বার যথাসাধ্য খোজ করে।

অবশেষে সন্ধ্যার দিকে আব্বার মৃতদেহ জালে আটকা পড়ে।

মৃত দেহটি নৌকায় তুলে গ্রামের মানুষ আমাদের বিয়ে বাড়িতে নিয়ে যায়।

সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ থেকে

মেঘনায়

– মুন্নী

আমার বিয়ের পরের বছরের ঘটনা। আমার শ্বশুরবাড়ি হিজলার বাহেরচর গ্রামে। বরিশাল থেকে যেতে হলে তখন ছোট লঞ্চে চড়ে যেতে হতো।

সে বছর কোরবানি ঈদের আগের দিন শ্বশুরবাড়ি রওনা হলাম। সময় ছিল দুপুর দুইটা।

লঞ্চ ছেড়ে এক ঘণ্টা চলার পরে হঠাৎ পূর্ব দিকে দেখা গেল এক খণ্ড কালো মেঘ। মেঘটা ক্রমেই সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়লো। যাত্রীদের মধ্যেও ধীরে ধীরে ভয় জেগে উঠলো। লঞ্চটা যখন চরমোনাইয়ের কাছাকাছি এলো তখন প্রবল বেগে একটা দমকা হাওয়া এসে লঞ্চটাকে কাত করে একদিকে হেলিয়ে দিল।

শুরু হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি। বৃষ্টিতে সমস্ত যাত্রীরা ভিজে গেল। কারণ জানালা দরজা বন্ধ করার কোনো উপায় ছিল না। লঞ্চের যাত্রীরা একবার এপাশে যায় তো আবার ব্যালান্স ঠিক রাখার জন্য অন্য পাশে আসে। মহিলা যাত্রী যতো ছিল, সবাই কান্নাকাটি, দোয়া পড়া শুরু করলো।

আমার হাজব্যান্ড আমার থেকে একটু দূরে ছিল। সে তাড়াতাড়ি আমাকে তার কাছে নিয়ে দাড়ালো। পরবর্তীকালে সে আমাকে বলেছিল, যদি মরতেই হয় তাহলে দুজনে এক সঙ্গে মরবো। এ জন্য কাছাকাছি দুজনে থাকা ভালো।

ভয়ে কি করবো ভেবে না পেয়ে চোখ বন্ধ করেছিলাম অনেকক্ষণ। আমার হাতে ছিল এক প্যাকেট বিস্কিট। ফাকে একটা দুটো করে খেয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ আমার ক্ষিধেও লেগেছিল খুব। লঞ্চের সারেং দক্ষতার সঙ্গে ধীরে ধীরে লঞ্চটাকে তীরে নিয়ে বেশ কতোক্ষণ ছিল।

অবশেষে আধঘণ্টা পরে নদী বেশ শান্ত হলো। লঞ্চ আবার চলা শুরু করলো। সন্ধ্যার পরে গিয়ে আমরা গ্রামের বাড়িতে পৌছালাম। শ্বশুরবাড়িতে এসে আব্বা আম্মাকে এই দুঃসহ অবস্থা জানাইনি। অবশ্য পরে তারা শুনেছেন।

এদিকে আমার আব্বা–আম্মা কেদে কেটে হয়রান।

এখনো বাড়িতে যাওয়ার সময় সেই দুঃস্মৃতি মনে পড়ে। তবে এখনকার লঞ্চগুলো বড়। আলাদা ক্যাবিন আছে। আরাম করে ভ্রমণ করা যায়। তারপরও মেঘনা নদী যখন পার হতে হয় তখন চুপচাপ ক্যাবিনেই বসে থাকি এক অজানা আশংকায়।

বরিশাল থেকে

উপকূলে

– জাফরুল আমিন

জন্মসূত্রে আমি দ্বীপবাসী। আমার জন্ম চল্লিশ দশকের শেষের দিকে হাতিয়া দ্বীপে। দ্বীপবাসী জেনে ভেবে বসবেন না, নৌকাই বোধহয় আমাদের জীবন, নৌযান ছাড়া আমাদের গতি নেই। কথাটা ঠিক নয়, আবার ঠিকও। ঠিক নয় এ জন্য যে, আমাদের দ্বীপের অভ্যন্তরে নদী–নালা, খাল– বিল নেই, যেগুলো পাড়ি দিতে কোনো নৌযানের দরকার হতে পারে। আবার ঠিক এ জন্য যে, ছোট্ট এ দ্বীপে ছোট্ট হয়ে থাকতে না চাইলে নৌপথ পাড়ি দিতেই হবে।

আমাদের চারদিকেই নদী। বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে আমাদের নৌপথ ছাড়া গতি নেই। চারদিক আমাদের জন্য খোলা হলেও মালয়শিয়া বা অস্ট্রেলিয়ার যাত্রী ছাড়া দক্ষিণ দিকে যাওয়ার চিন্তা কেউ করে না। চট্টগ্রাম যেতে হলে পূর্বে এগিয়ে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে খরস্রোতা কর্ণফুলি নদীতে দুই ঘন্টা নৌভ্রমণ করে তবে যেতে হয়। বরিশাল বা ঢাকা যেতে হলে পশ্চিমমুখো হয়ে কয়টা ছোট শান্ত নদী পাড়ি দিয়ে, বরিশাল নোয়াখালী যেতে হলে উত্তরে পাচ ছয় ঘণ্টা মেঘনার মোহনা বেয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড তথা এ পৃথিবীর অন্য কোনো গন্তব্যে পৌছাতে হলে এ তিন দিকের একদিকে যেতেই হবে। এবং যেতে হলে হাতিয়া দ্বীপবাসীর নৌ ভ্রমণ ছাড়া গতি নেই।

১৯৬২ সালে আমি ক্লাস সেভেন–এর ছাত্র। সেই কিশোর বয়সে বাবার হাত ধরে ঢাকার যাবার উদ্দেশ্যে প্রথম উত্তরমুখো হয়ে মেঘনা পাড়ি দিয়ে নোয়াখালী যাই। সেটাই আমার জীবনের প্রথম নৌ ভ্রমণ। গত বিয়াল্লিশ বছরে জীবন ও জীবিকার তাগিদে অসংখ্যবার পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরের নৌপথগুলোতে আসা–যাওয়া করতে হয়েছে।

১৯৬৫ সালে এসএসসি পাস করার পর চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজে ভর্তি হই। তখন থেকেই আমার নিয়মিত নৌপথ ভ্রমণ শুরু। বর্ষা মরসুমে বঙ্গোপসাগর এবং মেঘনার মোহনা খুবই উত্তাল থাকে বলে আমরা নোয়াখালী হয়ে না গিয়ে সাধারণত চট্টগ্রাম থেকে বরিশালগামী বড় জাহাজগুলোতে উঠে পথে হাতিয়া নেমে যাই। এ জাহাজগুলো সপ্তাহে দুই দিন মাত্র আসা যাওয়া করে। আবহাওয়া খারাপ থাকলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলাচল বন্ধ করে বসে থাকে।

জরুরি প্রয়োজনে আমরা বসে থাকি না। আবহাওয়া বিভাগের ছোটখাটো বিপদ সংকেত উপেক্ষা করে চলে আসি নোয়াখালীর উপকূলে চরজব্বার ঘাটে মেঘনার মোহনা পাড়ি দিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য। অনেক সময় এসে দেখি আবহাওয়া বিভাগের বিপদ সংকেতের কারণে অথবা যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে সি-ট্রাক সার্ভিস বন্ধ। তখন কয়েকজন সাহসী যাত্রী একত্রিত হয়ে ছোটখাটো ইঞ্জিনচালিত নৌকা ভাড়া করে পাড়ি দিই।

প্রয়োজনের তাগিদে এ সুদীর্ঘ জীবনে বহুবার আবহাওয়া বিভাগের ছোটখাটো বিপদ সংকেত উপেক্ষা করে জীবনের ঝুকি নিয়ে এ বিপদ সংকুল পথ পাড়ি দিয়েছি। অনেকবার চরজব্বার ঘাটে এসে দেখেছি যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে সি-ট্রাক সার্ভিস বন্ধ। লোকজন একত্রিত করে ছোট খাটো ইঞ্জিনচালিত নৌকা ভাড়া করে পাড়ি দিয়েছি।

আমার স্মৃতিতে অনেক নৌ ভ্রমণের স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে আজ যে ভ্রমণটির কথা বলবো তা বিপদ সংকেত উপেক্ষা করা কোনো দুঃসাহসী ভ্রমণ নয়। আমার সে ভ্রমণের শুরু একদম শাদামাটা।

এখন থেকে বারো বছর আগের কোনো এক শীতের সকালে আমার কর্মস্থল চট্টগ্রাম থেকে হাতিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য নোয়াখালীর চরজব্বার ঘাটে এসে দেখি যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে সি-ট্রাক সার্ভিস বন্ধ।

শীতের সকাল, নদীর পানি তো দীঘির পানির মতো। সাত আটজন যাত্রী একত্রিত হয়ে একটা ছোটখাটো ইঞ্জিনচালিত নৌকা ভাড়া করে হাতিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। যাত্রী, মাঝি-মাল্লা সবার মধ্যে নিরুদ্বিগ্ন ভাব। চরজব্বার ঘাট থেকে হাতিয়া যেতে হলে মেঘনা যেখানে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে সে মোহনা অতিক্রম করে যেতে হয়। মোহনায় পৌছাতে হলে জোয়ারের অনুকূলে যেতে এক ঘণ্টার পথ অতিক্রম করতে হয়। এ পথে পানির গভীরতার হদিশ রাখতে অনেক অভিজ্ঞ মাঝিকেও হিমশিম খেতে হয়। কারণ ভাঙন কবলিত উপকূলের পানি সব সময়ই দই ঘোলা হয়ে থাকে। পথে অসংখ্য ডুবোচর। এসবের অনেকগুলো সকালে আছে তো বিকেলে নেই। সকালে অথৈ পানি, বিকেলে সেই জায়গায় হাটুসম পানি অথবা জেগে ওঠা চর। নৌকায় বসে বোঝার জো নেই কোথায় পানির গভীরতা কতোটুকু।

এমনি এক অবস্থায় আমরা সাত আটজন যাত্রী শীতের সেই সকালে পিকনিক মেজাজে বসে আছি। যতোদূর দৃষ্টি যায় শুধু দই ঘোলা জলের সমারোহ। এখানে-সেখানে ভেসে ওঠা চরে মহিষের বাথানের সারি কালো রেখার মতো হয়ে আছে। কোথাও বা অল্প ডুবোচরে পানির মাঝে মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে উরি ঘাসের ঘন সারি।

নোয়াখালী উপকূলে বন বিভাগ সৃষ্ট বনায়নের নজর কাড়া অপরূপ দৃশ্য ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে হারিয়ে যেতে না যেতেই মাঝি-মাল্লাদের মধ্যে হঠাৎ চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষ্য করি। তারা এরই মধ্যে ইঞ্জিন বন্ধ করে নৌকার গতির দিকে লক্ষ্য রেখে হাল ধরে রেখে নিরুপায় হয়ে বসে আছে নিয়তির সিদ্ধান্তের ওপর। তাদের মুখে শংকার চিহ্ন দেখে যাত্রীদের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে তা সংক্রমিত হলো।

তাদের কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম ঝড়-বাদলহীন শীতের এই নিস্তরঙ্গ মোহনায় আমরা এক অন্য রকম মহা বিপদের সম্মুখীন। বঙ্গোপসাগরে তখন ভাটার সময়। উপকূলে উপচেপড়া জোয়ারের পানি প্রবল বেগে তার উৎস অভিমুখে ধাবমান। স্রোতের এই প্রচণ্ড গতির কাছে সেই ছোট্ট নৌকার মাঝি-মাল্লারা অসহায়। আগে বলেছি, এ পথে ঘোলা পানিতে অসংখ্য ডুবোচর যে, গতির সময় হঠাৎ যদি নৌকা কোনো ডুবোচরে ধাক্কা

খায় তাহলে নৌকা উল্টে যাবে। যাত্রীরা থেকে যাবে উল্টে যাওয়ার নৌকাটার ভেতর। নৌকাটিকে যাত্রীসহ সে অল্প পানিতে প্রচণ্ড স্রোতে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাবে অনেক দূরে। আটকে পড়া থাকা যাত্রীদের বেচে থাকতে পারাটা হবে অলৌকিক।

বিপদ বুঝতে পেরে তখন কায়মনোবাক্যে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করছি আর অপেক্ষা করছি আমাদের সম্ভাব্য পরিনতির কথা। এমনি সময়ে নৌকাটি প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে রইলো। আমি ছাড়া মাঝি–মাল্লাসহ সব যাত্রীরা চোখের নিমেষেই নৌকা থেকে ছিটকে পড়লো ঝাড়া শেষ হলে যেমন করে কুলা থেকে সব চালকে এক সঙ্গে অন্য পাত্রে ফেলা হয় তেমনিভাবে। সবাই হাটু পানিতে দাড়িয়ে আছে। আমি যে কেবল কি কারণে এই প্রচণ্ড ধাক্কা ও ঝাকুনির পরেও দিব্বি আমার বৃফকেসটাসহ কাত হওয়া নৌকায় বসে থাকতে পেরেছিলাম তা আজও জানি না।

সেদিন আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন সেনাবাহিনীর সদস্য। অনেক দিন পরবাসের কঠিন জীবনের পর তিনি ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার সময় সংসারের অনেক অত্যাবশ্যকীয় খুটিনাটির সঙ্গে বাচ্চাদের জন্য অনেক খেলনাও সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই কুলার ঝাকুনির পর যার যা কিছু ছিল সবই পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল স্রোতের টানে বিদ্যুৎ চমকানোর মতোই আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। সেদিন রিক্ত হাতে আমি ছাড়া সবাইকে শুধু প্রাণটা নিয়ে বাড়ি যেতে হয়েছিল।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা তো পেলাম সে যাত্রা। কিন্তু মাঝিদের কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম আমাদের সামনে আরেকটা বিপদ অপেক্ষা করছিল। সেটার ধরনও ভিন্ন। জোয়ার আসতে তখনো ঘণ্টা দুয়েক বাকি ছিল। সে দুই ঘণ্টায় পানির সঙ্গে আসা বালিরাশি জমে যাওয়ার কারণে নৌকাটা যেন বালি মাটিতে আটকে না যায় সে জন্য নৌকাটিকে অবিরাম নাড়াচাড়া করতে হবে। এবং নৌকা যদি বালিতে আটকা পড়ে যায় তাহলে জোয়ারের সময় নৌকাটিকে আর ভাসানো সম্ভব হবে না। আমাদেরকে পানিতে অনির্দিষ্টকাল ভাসার জন্য অথবা ডুবে জীবন লীলা সেই ঘোলা পানিতে সাঙ্গ করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। না হলে অপেক্ষায় থাকতে হবে আরেকটা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য।

সেই দুই ঘণ্টা আমরা সবাই মিলে নৌকাটিকে স্থির থাকতে দিইনি। ঠিক সময়ে জোয়ার এলো, নৌকা ভাসলো, আমরা বাড়ি পৌছাতে পারলাম।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

ডেভেনপোর্টের অলিভিয়া

– প্রদীপ কুমার দেব

জানালার দিকে একটা আঙুল তুলে প্রফেসর স্টাম্প বললেন, ওই যে একটা আইল্যান্ড দেখা যাচ্ছে ওখানে, ওটাই ডেভেনপোর্ট। এই সামারটা আমরা ওই আইল্যান্ডে কাটাচ্ছি। বিকাল সাড়ে পাচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়বো। সোয়া পাচটার পরে আর কোনো কাজ রেখো না হাতে। আমি ডেকে নেবো তোমাকে তোমার অফিস থেকে।

ইংরেজি ভাষায় আমাদের মতো তুমি আপনির সমস্যা নেই। তবে প্রফেসর স্টাম্প বাংলা জানলে আমাকে তুমি করেই বলতেন বলে আমার ধারণা।

প্রফেসর অ্যালেন স্টাম্প। অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর। তার আমন্ত্রণে অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট হিসেবে যোগ দিয়েছি গতকাল। ফিজিকাল সায়েন্স বিল্ডিংয়ের চার তলায় ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট। একটা প্রফেসরিয়াল অফিস রুম খালি ছিল। সেটাই আমাকে দেয়া হয়েছে এই দেড় মাসের জন্য। এতো বড় অফিস ঘর নিয়ে কি করবো বুঝতে পারছি না।

সবে পিএইচডি থিসিস জমা দিয়েছি মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে। এখনো রেজাল্ট হয়নি। এর মধ্যেই প্রফেসর স্টাম্পের আমন্ত্রণ। প্রফেসর স্টাম্পের বন্ধু আমার পিএইচডি সুপারভাইজার প্রফেসর কেন এমোস। সেই সুবাদেই আমার জন্য এই সুযোগ। কাল ডিপার্টমেন্টে যোগ দিয়েই বুঝতে পারছি প্রফেসর স্টাম্প দারুণ ব্যস্ত মানুষ। খুব বেশি কথা বলেন না। কিন্তু যা বলেন মনে হয় খুব ভেবে চিন্তে বলেন। কালকেই বলে রেখেছিলেন আজ তার বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ।

একটু আগে অফিসে এসে গুডমর্নিং বলতে এসেছি প্রফেসর স্টাম্পকে। তার অফিসটা আমার অফিসের চেয়ে আয়তনে অনেক ছোট। কাগজপত্র, বই–খাতা, কমপিউটার–প্রিন্টার সব মিলিয়ে গুদামের মতো করে ঠাসা। দুইটা টেবিলে মোটা তিনটা চেয়ার। দুইটাতে তিনি বসেন। আরেকটা চেয়ারে অনেক বইপত্র রাখা। বোঝাই যাচ্ছে তার অফিসে তিনি কাউকে বসতে বলেন না। অফিসের পশ্চিম দিকের পুরো দেয়াল জুড়ে কাচের জানালা। সেই জানালার পর্দা এখন সরানো। মনে হচ্ছে সেপ্টেম্বরের ঝকঝকে, নীল আকাশ আর সাগর এসে মিলেছে সেখানে। চোখ তুলে তাকালেই দেখা যাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর, তার বুকের দ্বীপ দেশ নিউ জিলান্ডের দ্বীপ ডেভেনপোর্ট। সকালের মসৃণ রোদে অপরূপ লাগছে দেখতে। আমার অফিস থেকেও সাগর দেখা যায়। তবে এতোটা কাছে মনে হয় না। প্রফেসর কাজে ডুবে গেছেন আবার। আমি আস্তে করে দরজাটা টেনে দিয়ে চলে এলাম।

নিউ জিলান্ডের সামাজিক নিয়ম–কানুন এখনো কিছুই জানি না। ডিনারে যাবার সময় সঙ্গে কিছু নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ এখানে আছে কি না, থাকলে কি নিয়ে যাওয়া যায়? নিউ জিলান্ডে এই প্রফেসর ছাড়া এখনো কাউকে চিনি না। অফিসে বসে ভেবে কোনো কূলকিনারা পেলাম না। এখানেও অস্ট্রেলিয়ার মতো সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে। মনে হচ্ছে অন্য ব্যাপারেও মিল থাকবে। অ্যালেনের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললাম টেলিফোনে। এই মহিলা খুব প্রাণবন্ত। দেখতে অনেকটা জেমস বন্ড মুভির মানিপেনির মতো লাগে।

তিনি সমাধান দিয়ে দিলেন মুহূর্তেই। অ্যালেন কি পছন্দ করেন, তারচেয়েও জরুরি হলো অ্যালেনের বৌ সিন্থিয়া কি পছন্দ করেন। কারণ যেহেতু বাড়িতে যাচ্ছি ডিনারে সেহেতু আসল হোস্ট হলেন সিন্থিয়া। সিন্থিয়া একটা বিশেষ ব্র্যান্ডের অস্ট্রেলিয়ান মদ পছন্দ করেন।

কিন্তু আমি তো আসার সময় অস্ট্রেলিয়া থেকে সেই মদ নিয়ে আসিনি।

আমার আনাড়িপনায় সেক্রেটারি খুজ মজা পেলেন মনে হলো। খুব বেশি বোকা ছেলেমেয়েদের প্রতি মায়ের যেমন একটা বিশেষ স্নেহের প্রশ্রয় থাকে, সে রকম তিনিও আমাকে কোনো চিন্তা করতে নিষেধ করলেন যা করার তিনিই করবেন। করলেনও তাই। বিকেলে আমার অফিসে এসে দিয়ে গেলেন সুন্দর করে র‍্যাপিং করা এক বোতল মদ।

প্রফেসর স্টাম্পের ঘড়ি সম্ভবত আমার ঘড়ির চেয়ে মিনিট পাচেক ফার্স্ট। পাচটা পচিশে তিনি আমাকে অফিস থেকে ডেকে নিলেন। অকল্যান্ড শহরটি অনেকগুলো মৃত আগ্নেয়গিরির ওপর অবস্থিত বলে সমতল রাস্তা খুব কমই আছে। বিল্ডিংগুলোও সব ছোট–বড় টিলার উপরে বসে আছে। এখন এই দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় হচ্ছে দিনে দিনে। পৃথিবীতে সবচেয়ে আগে সূর্য ওঠে এখানে, এই নিউ জিলান্ডে। সূর্য ডোবেও আগে। কিন্তু এই সাড়ে পাচটাতেও দুপুরের রোদ। ইউনিভার্সিটিটা ডাউনটাউনের মধ্যেই। পশ্চিম দিকে সামান্য কিছু দূর হাটলেই ফেরিঘাট। এখান থেকে ডেভেনপোর্ট ছাড়াও আরো অনেক জায়গায় ফেরি যায়। অকল্যান্ডে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা পাওয়া খুব সমস্যা। তাই অনেকেই গাড়ি বাড়িতে রেখে আসে অফিসে আসার সময়।

অ্যালেন জানালেন, তারা সামার কাটানোর জন্য ডেভেনপোর্টের বাড়িটা কিনেছেন বেশি দিন হয়নি এখনো। ডেভেনপোর্টে যাওয়ার জন্য ফেরির টিকেট চার ডলার। আমাকে টিকেটের দাম দিতে দিলেন না প্রফেসর।

ফেরি বলতে দেশের বাইরে আসার আগ পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যেটাতে করে গাড়িসহ লোকজন পারাপার করা হয়। দাউদকান্দি ফেরি ইত্যাদি। কিন্তু দেখি আমাদের দেশের লঞ্চ স্টিমার এখানে ফেরি হয়ে বসে আছে।

বেশ সুন্দর দোতলা একটা ফেরিতে উঠে বসলাম। আমাদের এই ফেরিতে যাত্রী ধারণ ক্ষমতা একশ দশজন। ফেরিতে ওঠার সময় যারা টিকেট চেক করছে তারা যাত্রী সংখ্যার হিসাবও রাখছে। একশ দশজনের বেশি একজনও উঠতে দেবে না। এরা আইন জারি করলে তা মেনে চলে। কিছু দিন আগে নো পার্কিং জোনে গাড়ি পার্ক করার অপরাধে প্রধানমন্ত্রী হেলেন ক্লার্ককে পার্কিং টিকেট ধরিয়ে দিয়েছে একজন পার্কিং মিটার রিডার। প্রধানমন্ত্রী জরিমানার টাকা পরিশোধ করেছেন।

অফিস ছুটির এই সময়ে ফেরি ভর্তি হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। আমরা দোতলায় খোলা ডেকের ওপর দাড়িয়ে আছি রেলিং ধরে। অ্যালেন আমাকে দেখাচ্ছেন অকল্যান্ড সিটির আকর্ষণীয় বিল্ডিংগুলো। সূর্যের আলো পড়ে সাগরের পানি ঝলমল করছে।

ফেরি ছেড়ে দিল। আশপাশে অনেকগুলো ছোট ছোট স্পিডবোট। হারবারের পাশে পাশে অনেকগুলো জেটি। ফেরির আনাগোনা অবিরাম। ফেরি আস্তে আস্তে পেছনের দিকে সরে গিয়ে গতি বাড়াতে শুরু করেছে। এবার পুরো অকল্যান্ড সিটিকে দেখা গেল এক ফ্রেমে। মনে হচ্ছে পানির ওপর জেগে উঠেছে একটা চমৎকার শহর। অকল্যান্ড টাওয়ার দেখা যাচ্ছে মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে। দূরের শহরের দক্ষিণ দিকে বিশাল লম্বা একটা সেতু দেখা যাচ্ছে। কোথায় যায় এই সেতু দিয়ে? প্রশ্নটা করে ঘাড় ফিরিয়ে অ্যালেনের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি একটু দূরে সরে গিয়ে মোবাইলে কথা বলছেন। ওই সেতু পথেও ডেভেনপোর্ট যাওয়া যায়।

আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন একজন মহিলা। দেখেই বুঝতে পারছি অফিস থেকে ফিরছেন। গলায় চমৎকার একটা স্কার্ফ বাধা, তারচেয়ে চমৎকার হলো তার গলার স্বর ও মিষ্টি হাসি।

অকল্যান্ডের সব মানুষই কি এমন আন্তরিক!

আধঘণ্টার মধ্যেই ফেরি ডেভেনপোর্টের ঘাটে এসে ভিড়লো। চমৎকার ছবির মতো সুন্দর এই দ্বীপ ডেভেনপোর্ট। ফেরিঘাট থেকে কয়েক গজের মধ্যেই পাকা রাস্তা। গাড়ি চলার রাস্তার পাশে সাগরের ধার ঘেষে পায়ে চলা পথ আর সাইকেল ট্র্যাক।

অ্যালেন বললেন, মিনিট দুয়েক হাটতে হবে এখান থেকে।

আধমিনিটে হেটে বড় রাস্তায় উঠেই দেখি মেরিলিন মনরোর মতো সুন্দরী এক নারী অ্যালেনের কাছে এসে দাড়ালেন আর আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালেন। বললেন, ওয়েল কাম টু ডেভেনপোর্ট, প্রদীপ। আই এম সিন্থিয়া, অ্যালেন ইজ মাই হাজব্যান্ড।

আমি হতবাক হয়ে গেছি। সিন্থিয়াকে দেখে বোঝার উপায় নেই তার বয়স কতো। তাছাড়া এই প্রথম কোনো ইংরেজি ভাষীকে দেখলাম আমার নাম শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেছেন। আরো অবাক হলাম তার হাত জোড় করে নমস্কার করা দেখে।

সিন্থিয়া আমার পাশে পাশে হাটছেন এখন। এই রাস্তায় সুন্দর সুন্দর এক তলা ছোট বাড়িগুলো সমুদ্রের দিকে মুখ করে আছে। কয়েকটা বাড়ি পরেই রাস্তা পার হয়ে শাদা একটা বাড়ির বারান্দায় উঠে এলাম অ্যালেন আর সিন্থিয়ার সঙ্গে। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা ফুলের বাগান। এই বাড়িগুলোর কোনো সীমানা দেয়াল নেই। সিন্থিয়া ওয়েলকাম জানাচ্ছেন আবার।

ঘরের মেঝেতে পুরু লাল রঙের কার্পেট মোড়া। জুতা খুলতে যাচ্ছিলাম, মানা করলেন সিন্থিয়া। বললেন, পরিচয় করিয়ে দিই, আমাদের মেয়ে অলিভিয়া, আর এই হলো প্রদীপ।

অলিভিয়া নামে মেয়েটার দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো একটা ইলেকট্রিক শক খেলাম। সিন্থিয়া কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?

এই মেয়ে কিভাবে সিন্থিয়ার মেয়ে হতে পারে? অলিভিয়া একটা ছোটখাটো পবর্ত। মুখে গোফ একে দিলে বাংলাদেশের সিনেমা অভিনেতা জসিমের মতো লাগবে। বিরাট হাত পা আর পেটে, বুকে তাল তাল মেদ থল থল করছে।

আমার দিকে তাকিয়ে অলিভিয়াও হাত জোড় করে নমস্কার করে বললো, হাই প্রদীপ।

অলিভিয়ার গলার স্বরও সিন্থিয়ার মতো মিষ্টি, নমস্কার করার ভঙ্গিটাও একই রকম আর আমার নাম সেও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেছে। তারপরও বিশ্বাস করতে পারছি না সিন্থিয়ার মেয়ে অলিভিয়া। অলিভিয়াকে দেখতে অনেকটা নিউ জিলান্ডের আদিবাসী মাওরিদের মতো লাগছে।

ডিনার টেবিলে খাবারের আয়োজন দেখে আরো অবাক হবার পালা আমার। বাঙালি খাবার টেবিল জুড়ে। মাছ ভাজি, ডাল, একটা বড়ার মতো দেখা যাচ্ছে, ভাত, মাংস টেবিল ভর্তি আয়োজন। সিন্থিয়ার ব্যাখ্যার পরে আমার বিস্ময় কিছুটা কাটলো। আমার আসার কথা ঠিক হয়েছে মাস খানেক আগে। তখন থেকেই চলছে সিন্থিয়ার এই প্রস্তুতি। তিনি অকল্যান্ডে মিউজিয়ামের বড় কর্তা। আমার ডিটেইলস জেনেছেন আমার সিভি থেকে। তারপর বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার জন্য মিউজিয়ামে কোনো বাংলাদেশিকে না পেয়ে ইনডিয়ানদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন কিছু কিছু। নমস্কারের ব্যাপারটা জানার পর প্র্যাকটিস করেছেন মা আর মেয়ে মিলে। রান্নাটা শিখেছেন ইনডিয়ানদের কাছ থেকে। সেটা বুঝতে পারছি শরবতের মতো মিষ্টি ডাল খেয়ে।

মনটা ভরে গেল আমাকে এতো গুরুত্ব দেয়া হয়েছে জেনে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা বললাম, সার্বজনীন উৎসবের কথা বললাম, আতিথেয়তার কথা বললাম।

গল্পে গল্পে কেটে গেল অনেকটা সময়। এবার ফেরার পালা। ফিরতি ফেরি ধরার কথা বলতেই অলিভিয়া বললো, আমি তোমাকে পৌছে দেবো। কোন পথে যেতে চাও বলো। সমুদ্র পথে, নাকি স্থলপথে?

সূর্য ডোবার এই সময়ে বারান্দা থেকেই মনে হচ্ছে সাগর আমাকে ডাকছে। সিন্থিয়া আর অ্যালেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অলিভিয়ার পিছু পিছু একটা শাদা স্পিডবোটে গিয়ে উঠলাম।

বোটের পেছনে হন্ডা ইঞ্জিন লাগানো। কতো হর্স পাওয়ারের কে জানে! স্পিডবোটে অলিভিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বোটটা প্রায় কাত হয়ে গেল। ধাম করে বসে পড়লো চালকের আসনে।

পাশে আরেকটা সিট থাকার কথা। কিন্তু সেটার বেশির ভাগ এখন অলিভিয়ার দখলে। আমি কোথায় বসবো বুঝতে পারছি না।

অলিভিয়া ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে ততোক্ষণে। বসে পড়ো এখানে বলে নিজে একটু সরে বসতে চেষ্টা করলো। তাতে কিছুই এদিক–ওদিক হলো না।

কোনো রকমে বসলাম তার পাশে। লাইফ জ্যাকেটটা দেখেই পরে নিলাম।

অলিভিয়ার ফুটবল মুখে সামান্য হাসির রেখা। মনে হচ্ছে আমি ভয় পাচ্ছি দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

স্পিডবোট শব্দ করে চলতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড বেগে প্রপেলার ঘুরিয়ে ফেনা উৎপাদন করতে করতে সামনের দিকে ছুটে চলেছে। পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সূর্য ডুবছে। পানিতে কাপছে লালচে কালো আকাশ। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি পশ্চিম আকাশের দিকে। সূর্য ডুবে গেছে ডেভেনপোর্টের সাগরে। কিন্তু আকাশে এখনো তার সোনালি স্মৃতি।

চলো তোমাকে একটা মজার দৃশ্য দেখাই। বলতে বলতে হঠাৎ একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল স্পিডবোট। উল্টে যেতে যেতে থেমে গেছে কোনো রকমে। এবার সত্যিই ভয় পাচ্ছি। কারণ যদি স্পিডবোট উল্টায় আর চাপা পড়ি অলিভিয়ার নিচে তাহলে সাতারের চেষ্টাও করতে পারবো না।

অলিভিয়ার কোনো ভাবান্তর নেই। আবার গতি বাড়াচ্ছে সে স্পিডবোটের।

আরো অনেক স্পিডবোট এখানে–সেখানে, ফেরি আসছে, যে কোনো সময় ধাক্কা লেগে যেতে পারে যে কোনোটার সঙ্গে। আমার মনে হচ্ছে প্রাণটা মুখের কাছে এসে কোনো রকমে আটকে আছে। মুখ খুললেই তা বেরিয়ে যাবে। দাতে দাত চেপে বসে রইলাম। অলিভিয়া স্পিডবোট ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছে ডেভেনপোর্ট আইল্যান্ডের পশ্চিম পাশে। প্রশান্ত মহাসাগরের এ রকম প্রশান্ত রূপ আগে দেখিনি কোনোদিন। সূর্য আবার দেখা যাচ্ছে এখানে যেন অপেক্ষা করছে কোনো বিদায় বাশির।

যতোদূর চোখ যায় কেবল পানি আর পানি এবং দিগন্তে সূর্য রাশি রাশি সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে এই অসীম জলরাশির ওপর।

স্পিডবোটের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল অলিভিয়া।

কখন মন থেকে মৃত্যু ভয় চলে গিয়ে একটা সীমাহীন ভালো লাগা ভর করেছে! অলিভিয়ার দিকে তাকালাম। তার মুখে সূর্যের আভা চিকচিক করছে। কিন্তু দুই চোখে কেমন যেন বিষাদের ছায়া। মানুষের তো কতো রকমের বিষাদ থাকে মনে।

কতোক্ষণ এভাবে কেটেছে জানি না। ইঞ্জিনের শব্দে সংবিৎ ফিরে পেলাম।

চলো এবার যাওয়া যাক। বলতে বলতেই স্পিডবোটের গতি যেন লাফ দিয়ে বেড়ে গেল।

সাগরে স্রোতের বেগ অনেক হলেও ভয়ের স্রোতটা এখন আর নেই তেমন। অলিভিয়া ডেভেনপোর্ট বৃজের দিকে নিয়ে গেল স্পিডবোট।

নিচ থেকে দেখলাম বৃজটাকে। ওপর দিয়ে ছুটে চলছে গাড়ি, নিচ থেকে খেলনা গাড়ির মতো লাঘছে তাদের কোনো কোনোটাকে। অকল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরানো যায় না এখন। হাজার আলোয় উজ্জ্বল অকল্যান্ডের প্রতিবিম্ব সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুলছে। তাকে আরো দুলিয়ে দিয়ে ফেরিঘাটের পাশে স্পিডবোট ভেড়ালো অলিভিয়া। আমার লাইফ জ্যাকেটটা খুলে নিতে নিতে বললো, খুব ভয় পেয়েছিলে তো? আমাকে সবাই খুব ভয় পায়। আই অ্যাম সরি।

কি বলবো ঠিক করে উঠতে পারছি না। অনেক কথা হয়তো বলা যায়। কিন্তু এখন কোনো কথাই বের হচ্ছে না মুখ দিয়ে। ঘাটে উঠে দাড়ালাম।

অলিভিয়া তার মোটা কর্কশ হাতে আমার হাতটা ঝাকিয়ে দিয়ে স্পিডবোট নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

বার হারবার, মেইন, আমেরিকা থেকে
deb.7@osu.edu

বিশ্বাস

– জনি

মেয়েটির নাম দিয়া। শ্যামবর্ণের একহারা গড়নের বিশ একুশ বছরের তরুণী। তার চোখগুলো খুবই সুন্দর। বরিশাল যাচ্ছিলাম বন্ধুর বাড়ি। তার সঙ্গে পরিচয় লঞ্চের ডেকে। সে ডেকের যাত্রী এবং আমি ক্যাবিনের। তার রুচিশীল পোশাক–আশাক ও মার্জিত ব্যবহারে তার সঙ্গে আলাপ করতে ভালোই লাগলো।

কথায় কথায় জানলাম পরিবারের মেজ সদস্য সে। বড় ভাই বেকার। বাবা সামান্য কৃষক। শহরে সে পড়াশোনা করে এবং একটা চাকরি করে। এক কথায়, পরিবারের দায়িত্ব তার কাধে। প্রায়ই তাকে বরিশাল

যেতে হয়। তাই ডেকে অবস্থান করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। প্রত্যেকবার ক্যাবিন ভাড়া করার সামর্থ তার নেই।

কেমন যেন একটা সহানুভূতি জন্মালো তার প্রতি। নিজেকে খুব ছোট মনে হলো তার কাছে। আমার গন্তব্যে যেতে এক রাত বাকি। এই রাতটি ক্যাবিনে আরাম করে ঘুমিয়ে পার করতে পারি আর মেয়েটি হয়তো খোলা ডেকের এক কোণে বসে রাতটি জেগে কাটিয়ে দেবে। তাকে অনুরোধ করলাম আমার ক্যাবিনে থাকতে।

প্রথমে রাজি না হলেও আমার জোরাজুরিতে ক্যাবিনে থাকলো।

আমি ডেকে রইলাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়লাম মনে নেই। ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার ক্যাবিনের দরজা খোলা। ক্যাবিনের ভেতর মেয়েটি তো নেই-ই সঙ্গে আমার জিনিসপত্রও নেই।

মেয়েটি কোথায় গেল? লঞ্চের লোকদের কাছে জানতে চাইলে তারা বললো যে, ভোরবেলা লঞ্চ যখন ঘাটে ভিড়লো তখন কিছু যাত্রী নেমেছিল। এদের মধ্যে ব্যাগ হাতে একটা মেয়েও ছিল।

মেয়েটি আমার ব্যাগ কেন নিয়েছিল তা বুঝলাম ক্যাবিনে একটা চিঠি পেয়ে। তাতে লেখা ছিল –

বর্তমান যুগে কোনো অসহায় মেয়ের পক্ষে সম্মানজনক কাজ পাওয়া খুব কঠিন। তাই এ কাজ করছি। পারলে ক্ষমা করবেন।

পুনশ্চ : মানুষকে সহজে বিশ্বাস করবেন না, তাহলে ঠকতে হবে না।

অবাক হলেও মেয়েটার প্রতি রাগ হলো না।

এখন মাঝে মধ্যে চিন্তা করি এসব অসহায় মেয়েদের জন্য কিছু করতে। এদের জন্য আমরা আসলেই কি কিছু করতে পারি?

তেজগাঁও, ঢাকা থেকে

শংখ নদীর পাড়ে

বঙ্গপোসাগরের মোহনায় শংখ নদীর পাড়ে আমার বাড়ি। কোনো কবির কবিতায় ফুটে না উঠলেও চট্টগ্রামের ইতিহাসে কর্ণফুলী নদীর পরে শংখ নদীর অবস্থান। আমার কৈশোর, শৈশব কেটেছে শংখ নদীর অথই জলের সঙ্গে মিতালি করে। শংখ নদীতে নৌকা নিয়ে খেলেছি। দীর্ঘ নদী ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও অনেক যা লিখে হয়তো শেষ করা যাবে না। তবে আমার স্বরণীয় নৌ ভ্রমণের একটি ঘটনা ভোলার মতো নয়।

আমার এক বন্ধু পটুয়াখালীর গলাচিপায় চাকরি করতো। সেই সুবাদে আমরা দুই বন্ধু পটুয়াখালী বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম। কিভাবে যেতে হবে সেই গাইডলাইন পটুয়াখালীর বন্ধুর কাছ থেকে নিলাম।

দুই বন্ধু চট্টগ্রাম থেকে পটুয়াখালীর উদ্দেশ্যে প্রথমে বাসে করে ঢাকা রওনা হলাম। সকালে ঢাকা পৌছে নয়াবাজারের এক বন্ধুর বাসায় উঠলাম। বিকেলে সদরঘাট থেকে দুইজনের একটা ক্যাবিনের টিকিট সংগ্রহ করলাম। দীর্ঘ যাত্রা। তাই সাধারণ টিকেট নিলাম না।

যথাসময়ে লঞ্চে উঠলাম। লঞ্চের লবি ঘুরে-ফিরে দেখার পর আমাদের নির্দিষ্ট ক্যাবিনে প্রবেশ করলাম। প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনে মানুষের সমাগম একটু কম। নিরিবিলি পরিবেশ। হাওয়ায় মনপ্রাণ ফুরফুরে লাগছিল। লঞ্চ যখন সামনের দিকে এগোচ্ছিল। জ্যোৎস্নার আলোতে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য।

ঠিক তখনি পাশের ক্যাবিনের দরজা খুলতেই রূপসী বাংলার অপরূপ রমণীর মুখাবয়ব দেখতে পেলাম। জ্যোৎস্ননার আলো মাখা রজনীতে, পৃথিবীর সমস্ত রূপ যেন সেই নারীর ওপর ছিল।

জ্যোৎস্নার আলোকরশ্মি নদীর জলে পতিত হয়ে যে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হচ্ছে, মাঝে মধ্যে এসে সেই প্রতিবিম্বের আলোয় তার মুখাবয়বের অপরূপ প্রতিচ্ছবি আমাকে বার বার আকৃষ্ট করছিল। তার অপরূপ মায়াবী অবয়ব

দেখে নিজেকে সামলাতে পারলাম না। রূপ যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজের লজ্জা-শরম ত্যাগ করে তার সঙ্গে আলাপ জমানোর আকাঙ্ক্ষায় সামনের দিকে পা বাড়ালাম। তখন সে ক্যাবিনের সামনের রেলিং ধরে দাড়িয়েছিল। পেছনের খোলা লম্বা চুল আমাকে এতো বেশি আকৃষ্ট করছিল যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

দূরত্ব বজায় রেখে আমিও রেলিংয়ে দাড়ালাম। তখন তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অবজার্ভ করার চেষ্টা করছি। তাদের ক্যাবিনে লক্ষ্য করলাম, মেয়েটির মাও তার একটা ছোট ভাই, মনে হয়।

তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এক্সিউজ মি বলার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি ইয়েস বললো।

এবার একটু ভরসা পেলাম। তার সঙ্গে কে আছে জানতে চাইলাম।

তার মা ও ছোট ভাইয়ের কথা বললো।

আমার ধারণাই সঠিক। তারা যাচ্ছে পটুয়াখালী। মেয়েটির বাবা পটুয়াখালীর জেলা শহরেই সরকারি চাকরি করেন। ঢাকা থেকে বদলি হয়ে এসেছেন ছয় মাস আগে। মেয়েটির পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ঢাকাতে থাকেন। বাবার চাকরি স্থলে বেড়াতে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে আলাপচারিতায় মনে হলো মেয়েটি বেশ সন্তুষ্ট।

কিছুক্ষণ পর আমাদের আড্ডায় তার মাও যোগ দিলেন। মেয়েটির মামার বাড়ি চট্টগ্রামে। তাই মেয়েটির মা আমাকে খুব আন্তরিকতা দেখালেন।

মেয়েটির নাম জানতে চাইলাম।

বললো, অন্তরা।

অন্তরা কথা প্রসঙ্গে বললো, আপনি বয়সে বড় হবেন। তুমি করে বলেন।

আমার সাহস আরো দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আরো বেশি অন্তরঙ্গ হতে লাগলাম। অন্তরার মা কথায় কথায় বললেন, আমার দেশের ছেলে। তোমাকে আমার আত্মার আত্মীয় মনে হচ্ছে।

অন্তরার মাসহ অনেক কথা হলো। ঘরে বানানো নাশতা এনে খাওয়ালো। অন্তরার মায়ের আমার প্রতি আন্তরিকতা দেখে, আরো বেশি ঘনিষ্ঠ করে নিতে চাচ্ছিল।

অন্তরার ছোট ভাইয়ের বয়স আনুমানিক দশ বারো বছর হবে।

বাবা, তোমরা আলাপ করো, আমি ঘুমাবো।

তখন আমার বন্ধুটাও নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল। তার ছোট ভাইও ঘুমের ঘোরে আবোল-তাবোল বকছিল। তখন রাত একটা। কথাবার্তায় মনে হলো মেয়েটার পরিবারই প্রগতিশীল। মুক্ত মনের চিন্তাধারা, মাও তাই। রাত যতোই গভীর হচ্ছে ততোই জোৎস্নার আলো আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সাহস সঞ্চয় করে বললাম, তোমাকে আজ জ্যোৎস্নার আলোর মতোই সুন্দর লাগছে।

মেয়েদের প্রশংসা করলে খুশি হয়, সেদিনই আমি প্রথম বুঝলাম।

মেয়েটি প্রতিউত্তরে বললো, সত্যিই কি তাই? কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো, তোমাকেও সুন্দর দেখাচ্ছে।

আবেগের সুরে বললাম, তুমি অনেক বেশি সুন্দর!

সে শুধু হাসলো।

অল্পক্ষণে দুজন দুজনার কতো কাছাকাছি, সেই মুহূর্তে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। সেদিন লঞ্চের করিডোরে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছিলাম। অন্তরাকে সেদিন কিস দিতে চাইলাম। প্রথমে একটু বাধা দিল।

দুর্বলতার সুযোগে কাছে টেনে আনলাম। এবার বাধা দিল না। শুধু লজ্জায় তার ঠোট দুটি কাপছিল। আলতো করে তার ঠোটে আমার ঠোট ছোয়ালাম। প্রথম রূপসী নারীর ঠোটে ঠোট, চোখে চোখ রেখে অনুভব

করলাম, পৃথিবীর সমস্ত সুখ যেন আমাকে আচ্ছন্ন করছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে অন্তরার আলিঙ্গন, আমার সেই অন্য রকম অনুভূতি।

আমরা আরো কিছু দূর এগোতে চাইলাম। কিন্তু প্রকৃতি বাধা হয়ে দাড়ালো। জ্যোৎস্নার আলোয় উন্মুক্ত আকাশ এগোতে দিল না।

অন্তরার মায়ের ডাক পড়লো।

অন্তরা এসো ঘুমাবে, রাত অনেক হয়েছে।

অন্তরা যেতে চাইলো না। তবুও যেতে হলো।

সেই অনুভব, সেই আনন্দ, সেই সুখ আজও আমাকে তাড়া করে।

বদরপাতি রোড, চট্টগ্রাম থেকে

খেলনা

- আবু হিশাম

শহরে জন্ম হওয়ায় খেলনা, ছবি আর বইয়ের মাধ্যমেই নৌকার সঙ্গে প্রথম পরিচিতি। স্মৃতির সূচিতে জীবনে প্রথম বাবা মায়ের হাত ধরে মেলায় যাওয়া।

মেলায় ঢুকতেই পানি ভর্তি বড় লাল গামলায় ছোট জাহাজের আকর্ষণীয় মহড়ার প্রতি মা আমার আকর্ষণ দেখে বাবাকে জাহাজ কিনতে বাধ্য করেন।

আনন্দঘন চিত্তে জাহাজের ব্যাগটি অতি আগ্রহে নিজেই কাধে নিলাম। সকল আনন্দ ও পরিকল্পনা জাহাজ কেন্দ্রিক হওয়ায় মেলাটিকে চরম অস্বস্তিকর মনে হলো। তবুও মা বাবার হাত ধরে তাদের ইচ্ছাধীন ছিলাম।

এক সময় সকল অস্বস্তিকর ঘোরাঘুরি ও কেনাকাটার অবসান ঘটিয়ে বাসায় পৌছাতেই আমার আগ্রহে জাহাজের প্যাকেটটি খুলে জাহাজের ফিউয়েল ট্যাংকারটি যত্ন সহকারে কেরোসিন পূর্ণ করলেন মা। মাঝারি আকারের পানি ভর্তি গামলায় জাহাজটিকে ভাসাতে ভাসাতে ট্রেনিং দিচ্ছিলেন।

বাবা পাশে বসে আমাদের দেখে হাসছিলেন। মা তারপর সতর্ক বাণী শোনাতে শোনাতে জাহাজের চিমনির ভেতর মোমবাতির মতো অগ্নিসংযোগ করতেই ঠ্যাট ঠ্যাট শব্দ করে জাহাজটি চলতে শুরু করেছিল আর মহা আনন্দে আমি লাফাচ্ছিলাম।

এভাবে রাতেই ট্রেনিং ও ট্রায়াল পর্ব সেরে নিলাম। অবশেষে ক্লান্তি আর মায়ের কোমল স্নেহের উষ্ণতায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভেঙে চোখ মেলতেই ড্রেসিং টেবিলের ওপর জাহাজটিকে দেখে থেমে থাকা আনন্দগুলো ধারাবাহিকতা পেল। রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছিলাম কি না মনে নেই। দিনের স্পষ্ট আলোয় জাহাজটিকে আরো সুন্দর এবং প্রাণবন্ত মনে হলো।

জাহাজি পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে মায়ের হাতে নাশতার সংক্ষিপ্ত পর্ব সম্পন্ন করে, অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর ভঙ্গিতে জাহাজের খুটিনাটি পরীক্ষা শেষ করে জাহাজটি চালু করার জন্য মাকে অনুরোধ করলে বাথরুম ও চৌবাচ্চা সংলগ্ন বারান্দায় সতর্ক সংকেত শোনাতে শোনাতে পানি ভর্তি গামলা বসিয়ে জাহাজ চালু করে রান্নাঘরে ফিরে যান।

উল্লেখ্য যে, শহুরে জীবনে পানি সংকট মোকাবেলার জন্য বাসার বাথরুম সংলগ্ন বারান্দায় আমার থুতনির উচ্চতায় ওয়াল–টু–ওয়াল মাঝারি আকারের চৌবাচ্চাটা (হাউস) সব সময়ই পানিতে টইটম্বুর থাকতো। এতো সুন্দর চৌবাচ্চা থাকতেও গামলার মধ্যে জাহাজ চালাতে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। তাই মায়ের প্রাত্যহিক কর্মব্যস্ততার সুযোগে চলন্ত অবস্থায়ই জাহাজটিকে সংরক্ষিত পানির চৌবাচ্চায় স্থানান্তরিত করেছিলাম।

অনানুষ্ঠানিক মহড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার নাগালের বাইরে বিপরীত দিকের ওয়ালে সামান্য ধাক্কা দিয়েই জাহাজটি চৌবাচ্চায় তলিয়ে গেল। জাহাজ রক্ষার্থে টইটম্বুর পানিতে হাত বাড়িয়ে বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে শরীরের সামনের অংশ সিক্ত করেছিলাম। তারপরও হাল না ছেড়ে জাহাজ উদ্ধারের জন্য একটা চেয়ারকে চৌবাচ্চার দিকে টেনে আনার চেষ্টা করলে চেয়ারটা চেচিয়ে মাকে ডাকতেই মা হাজির।

আমার দিকে মা তাকিয়েই আমার অদূরে চৌবাচ্চার দিকে তাকালেন।

আমিও ভয়ার্ত চোখে তাকাতেই চৌবাচ্চার পানির ওপর ভাসমান রঙধনু দেখেছিলাম। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম যে, ওটা রঙধনু নয়, বরং জাহাজ বন্ধ হয়ে নিশ্চিত জ্বলে যাওয়ার হাত থেকে চৌবাচ্চার টলটলে পানিতে সদ্য মুক্তি পাওয়া কেরোসিনগুলোই আনন্দের রঙ-এ ভেসে ভেসে আমায় ভেংচি কাটছিল।

মা মহূর্তেই চৌবাচ্চার নিচের কোণায় মেঝে সংলগ্ন ছিদ্রপথে সযত্নে আটা প্লাস্টিকের ছিপিটিকে একটানে খুলে ফেললেন। অমনি ভীষণ বেগে চৌবাচ্চার পানিগুলোর সঙ্গে মুক্তির রঙে রঞ্জিত কেরোসিনগুলোও বাথরুম হয়ে টয়লেটের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হলো।

চৌবাচ্চার টলটলে পানিতে মুক্তি পাওয়া কেরোসিনের স্থায়ী আবাস হলো টয়লেটের অন্ধকারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চৌবাচ্চাটি পানি শূন্য হয়ে গেলে মা উপুড় হয়ে চৌবাচ্চার তলায় পড়ে থাকা জাহাজটি তুলেই জমে থাকা অব্যবহৃত জিনিসপত্রের ভেতর ছুড়ে ফেললেন।

জাহাজটির জন্য একটুও দুঃখ হয়নি, বরং মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জাহাজটির প্রতি হৃদয় থেকে শব্দহীন ধিক্কার বেরিয়েছিল।

এবার আমার পালা। আমার দুচোখ বেয়ে ভয় ও অপরাধের শব্দহীন অশ্রু ঝরছিল।

মা হাটু গেড়ে আমার দুই কাধ ধরে ঝাকুনি দিয়ে বললেন, জাহাজ চালানোর শখ মিটেছে?

আমি সরি বলতেই আমার ভেজা জামা-প্যান্ট খুলতে খুলতে বললেন, সরি তোমার বাপের জন্য রেখে দাও। অফিস থেকে এসে গোসলের পানি না পেলে সরি দিও গোসল করার জন্য। তারপর নাওয়া-খাওয়া শেষ করিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

জেগে দেখি দুজনেই আমার মাথার কাছে বসে গল্প করছেন। আমি উঠেই মায়ের গলা জড়িয়ে সরি আম্মু বলে কেদে ফেললাম।

মা সস্নেহে বুকে জড়িয়ে আদর করলেন।

তারপর বাবাও আমাকে কোলে টেনে নিতেই বাবাকেও সরি বলার সঙ্গে সঙ্গে বাবা হাসতে হাসতে বললেন, সরি তোর মাকে বলার জন্য শিখিয়েছি।

বারান্দায় গিয়ে দেখি চৌবাচ্চাটি তখনো পানি শূন্য। অথচ বাবা সেদিন একটুও রাগ করেননি।

আজ মনে হচ্ছে, জাহাজ কেনার সময় ফিটনেস সার্টিফিকেট দেখেননি বলেই হয়তো বাবা সেদিন রাগ করেননি। ধারণার সঠিকতা কখনোই যাচাই করা যাবে না। কারণ আমার নয় বছর বয়সেই বাবা পরপারে চলে যান। সরকারি বাসাটাও তখন ছেড়ে আসতে হয়।

সউদি আরব থেকে
connect_mr@yahoo.com

জলদস্যুর কবলে

- টিটন রহমান

মানুষকে জানা আমার হবি। তাদের জীবন বোধ, আচার-আচরণ, সাফল্য-ব্যর্থতা, স্বপ্ন-তুষ্টি, সুখ-দুঃখ, জীবনযুদ্ধ, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করি। সমৃদ্ধ হই, শুদ্ধ হই। সমাজের সর্বশ্রেণীর কোনো না কোনো মানুষের সঙ্গে আছে আমার সখ্যতা। এমনই একজন ঢাকায় স্থায়ী ঠিকানা বিহীন মোহাম্মদ আঙুর মিয়া। সে আমার

স্নেহধন্য। আমার দোকানের কর্মচারী। আঠারো সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে ঈদের দিনেও যার লক্ষ্য থাকে কিছু পয়সা উপার্জন।

২০০১ সালের ঈদের পরদিন যখন আমার হাতে অফুরন্ত অবসর, আঙুর মিয়া আবদার করলো, তার গ্রামের বাড়ি ওরোয়াইল যেতে হবে আমাকে।

আমার সহযোগিতায় তার কিছুটা উন্নতির ফলে তার পরিবারের কাছে আমি খুব প্রিয় মানুষ এবং গ্রামের অনেকেই আমার গল্প শুনেছে। আমার উপস্থিতি তাদের সময়কে খুবই আনন্দঘন করবে।

আমারও গণ্ডগ্রাম মানুষজনের জীবনাচারণ দেখতে সাধ হলো। কিন্তু বাদ সাধলো ভৈরব থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওরোয়াইল পর্যন্ত নৌপথে ভ্রমণের বিষয়টি। কারণ সাতার কাটার কৌশল আমার আয়ত্বে নেই। তাই নৌপথ কিংবা নৌভ্রমণ সচেতনভাবে এড়িয়ে চলি।

আঙুর আমাকে আশ্বস্ত করলো, ইঞ্জিন চালিত বড় নৌকা। এই তিতাস নদীতে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ চলাচল করছে। কখনোই দুর্ঘটনা ঘটে না। শান্ত নদী। আঙুরের একদফা এক দাবি, আমাকে যেতেই হবে।

অগত্যা রওনা দিলাম। বাসে ভৈরব যাবার পর রিকশায় নৌঘাটে গিয়ে যখন একটা ইঞ্জিন চালিত নৌকায় উঠলাম তখন লক্ষ্য করলাম, আঙুরের মতো আরো অসংখ্য নিম্ন আয়ের মানুষ যারা ঈদের দিনটিতেও পরিবার বিচ্ছিন্ন থেকে দুটো পয়সা উপার্জন করেছে তারা বাড়ি ফিরছে। সবার সঙ্গেই কম বেশি পোটলা–পুটলি। সবার চোখেমুখে যা স্পষ্ট তা হলো পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আনন্দময় সুখ–স্বপ্ন।

নৌকা যাত্রা শুরু করলো। ত্রিশজন যাত্রী। সহযাত্রীদের সঙ্গে নানান বিষয়ে কথা বলছিলাম। আমার ঈদের ছুটিকে উপভোগ্য এবং সার্থক মনে হচ্ছিল।

বিপরীত দিক থেকে আগত কোনো নৌকা কিংবা লঞ্চ যখন ক্রস করে ঢেউয়ের ঝাপটায় দোল খায় আমাদের নৌকা, আমি ভয় পাই। তা দেখে সহজ–সরল মানুষগুলোর আনন্দ আর ধরে না। আমার নার্ভাসনেস সহযাত্রীরা উপভোগ করে। সাতার না জানার কুফল এবং সম্ভবত কল্পিত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিল কেউ কেউ।

যাত্রী ভর্তি নৌকায় না উঠে রিজার্ভ নৌকা কেন নিলাম না এটা ভেবে আমি অস্থির। যাত্রীর ভারেও তো নৌকা ডুবি হতে পারে আশংকায় আমার অবস্থা ছ্যাড়াবেড়া। কিন্তু ভাবখানা এমন, কিসের ভয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকা ভ্রমণ আর ঢাকার রাজপথে রিকশা চলা তো একই কথা!

হঠাৎ দেখি দূরে পুলিশের ট্রলার। মাল বোঝাই, যাত্রী বোঝাই, ইঞ্জিন কিংবা হস্তচালিত নৌকাগুলো থামাচ্ছে এবং অলিখিত চুক্তি মোতাবেক টাকা নিচ্ছে।

আমার নৌকার চালক জানালো এরা টহল পুলিশ। চুরি–ডাকাতি যেন না হয়, অবৈধ মালামাল যেন পারাপার না হয়, মানুষের যাত্রাপথ যেন নির্বিঘ্ন হয় তা নিশ্চিত করতে টহল পুলিশ ডিউটিরত থাকে।

টাকা নিচ্ছে কেন জানতে চাইলে বললো, এদের পাল্লায় পড়লে কিছু না কিছু দিতেই হয়। না হলে নানান রকম ঝামেলা করে। কেস করে, জরিমানা করে।

আমাদের নৌকা যখন থামলো, একটু বীরত্বই দেখিয়ে ফেললাম। বললাম, আপনাদেরকে কোনো টাকা দেয়া হবে না। কোনো অসঙ্গতি থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা নিন।

বাংলার মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সঠিক প্রতিবাদকারী পেলে তার পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়। আবারও প্রমাণ পেলাম। মাঝিসহ যাত্রীরা আমার কথায় তীব্র প্রতিবাদী হয়ে উঠলো। এরপরের ঘটনা ভয়াবহ।

প্রকৃতপক্ষে টহলকারীরা ছিল ছদ্মবেশী ছিনতাইকারীর দল। স্থানীয়দের ভাষায় ডাকাত দল। হয়তো বা শুদ্ধভাবে এদেরকেই জলদস্যু বলা হয়।

অস্ত্র তাক করে যখন তারা ছিনতাই কর্ম শুরু করলো, আতংকিত লোকজনের নড়ন-চড়নে নৌকা দোলে, আমি ডুবে মরার ভয়ে দুলি।

দশ মিনিটের মধ্যে মানুষের ঈদ আনন্দসহ সব কিছু নিয়ে পুলিশের পোশাক পরা ছিনতাইকারীর দল দ্রুত সরে পড়লো।

আমার গেল মোবাইল, মানিব্যাগ, ঘড়ি এবং দামি চশমা।

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই যখন বিমূঢ়, যাত্রী আবু তালিব মন্তব্য করলো, কেয়ামত আসন্ন। সরকারি রক্ষকরা ডাকাতি শুরু করছে।

হতাশ এ যাত্রীটি দুই ঘণ্টা যাত্রাপথের সবাইকে এতোক্ষণ সরস কথা বলে মাতিয়ে রাখছিল।

আবু সাঈদ বলে, এরা পুলিশের লোক না। পুলিশের পোশাক পরা একদল খারাপ মানুষ যাদের মানবতা বলতে কিছু নেই।

ঢাকার পার্কের বাদাম বিক্রেতা কবীরের হাহাকার, *আমার কি হইবো? বাড়ির হগলে (সবাই) আমার লাগি হারুইয়া (দাড়িয়ে) রইছে।*

আঙুর মিয়ার ভাষ্য আমাকে নাড়া দেয়। সে যেসব বলে তার মূল কথা হলো, ঢাকায় ছিনতাই হলে পত্রিকায় খবর হয়। অথচ প্রত্যন্ত অঞ্চলে, বিশেষ করে নদীপথে প্রতিদিন অসংখ্য ছিনতাই, ডাকাতির মতো দুর্ঘটনা ঘটছে তা প্রশাসনের নজরে আসার কোনো সুযোগ নেই। আমার চমৎকার একটা নৌকা ভ্রমণ একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার মাঝে স্মৃতি হয়ে গেল।

ওয়ারি, ঢাকা থেকে
titon_wari@yahoo.com

হামার লালমনি

- আহমেদ আব্বাস

তোর ট্রাউজারে এতো প্রেমকাটা এলো কোথা থেকে?

আমি নির্বিকার। জবাব দিতে গলা শুকিয়ে আসছে। নতুন ভাবীর মুখে এমন কথা শুনে চমকিত হই। তার মুখের দিকে অপরাধী এবং বোকার মতো চেয়ে থাকি।

সে সময় নাইনের ছাত্র। প্রেম-ট্রেম এই জাতীয় শব্দ কখনো কানে এলেও বুঝতে শিখিনি। তবে মনে এবং শরীরে প্রথম সিগারেট টানার মতো ঢেউ খেলে যেতো।

আমাকে সহজ করার জন্য ভাবী আবার বললেন, আরে ছোড়া, চোরাকাটা, চোরাকাটা।

হয়তো ফুটবল মাঠের ওই ঘাসফুল লেগে গেছে। কিন্তু তুমি ওটা বললে কেন?

হামার লালমনিতে কলেজে এগুলোকে প্রেমকাটা বলতাম।

ভাবী সব কথা সুন্দর গুছিয়ে বললেও লালমনিরহাট বলতে প্রায়ই *হামার লালমনি* বলতেন। এ জন্য তাকে ফোড়ন কাটতাম।

আমার সাবলীলতা লক্ষ্য করে ভাবী আরেক একধাপ এগোতে চাইলেন, তোদের চলনবিল কোথায়? নানি বিল দেখতে চাইছে।

বিয়ের পর এটাই ছিল ভাবীর প্রথম নাইওর। সঙ্গে ছিল নানি, আমার বয়সী ছোট ভাই টিপু আর মামাতো বোন। ছেমড়িটার নাম আজ স্মরণাতীত। ধরে নিই জরী। তবে মধুর বচনে আমাকে বেয়াইসাব বলে ডাকতো। এটুকু স্মরণীয়।

লালমনিরহাট থেকে নাটোর দুইশ মাইলের উপরে ব্যবধান। অগ্রজ সে সময় অধুনালুপ্ত *দৈনিক বাংলা*–র নামকরা সাংবাদিক এবং শিক্ষক। হয়তো সে সুবাদেই লালমনিতে ভেসে গিয়ে ফেসে গিয়েছে।

শরৎকাল। আকাশের দুগাল বেয়ে তখনো টপটপ করে রস পড়ছে। আর আত্রাই নদীর দুকূল ফুলে–ফেপে ওঠেছে গাভীন গাইয়ের মতো। ক্রমেই বিদ্যুৎ প্রবাহের মাঝে হঠাৎ লোডশেডিংয়ের ন্যায় বর্ষণ সাময়িক স্থবির হয়।

ভাবীদের নিয়ে পানসি নৌকায় চলেছি ভাটির দিকে। এক মাইল ভাটিতে গিয়ে একটা ছোট নদী দিয়ে প্রবেশ করতে হয় চলনবিলে। ওই বিলে বজরা নৌকায় বসে বিশ্বকবি *সোনার তরী* গ্রন্থের অনেকগুলো কবিতাই রচনা করেছিলেন। নদীতে প্রবল স্রোত থাকায় বিলের মূলধারায় পানসি পৌছাতে সময় নিলনা পনেরো মিনিটও। ঘাটে নিজেদের নৌকা থাকায় নৌচালনা বিদ্যার কমতি ছিল না। এ কারণে নৌকায় একজন মাঝি ছাড়া হেলমসম্যান। হিসেবে অতিরিক্ত কারো প্রয়োজন হয়নি।

সুনীল জলরাশিতে নৌকা পালে বাতাস পেয়ে মাঝে মধ্যে কাত হয়ে যায়। সে সময় ভাবী টেসে যায় নানির কোলে। আর ছইয়ের ওপর বসা জরী আমার সংলগ্ন হয়। আমি এতে ভীত হয়ে হাল ঠিক রাখতে হিমশিম খাই। বেগতিক দেখে নৌকা চড়িয়ে দিই ধানক্ষেতের ওপরে। চারদিকে চমৎকার কোরাপাখির ডাক। কুর! কুর!

একটানা কিছুক্ষণ ধানক্ষেতে চলার পর পাওয়া যায় শাপলা–শালুকের ক্ষেত।

এবার ভাবী খুশি হয়ে ওঠেন। ছইয়ের ভেতর থেকে বের হয়ে শাপলা ফুল তুলতে থাকে।

নৌকার অদূরে অসংখ্য পানকৌড়ির জলকেলী দেখে আবেগে ভাবী নানিকে বলেন, দেখো, দেখো কালো পাখিটা এক ডুবে কতোদূর যায়। আবার ভেসে ওঠে। উড়াল দেয়। কি সুন্দর দৃশ্য!

তিন দিন পর। ভাবীর লালমনিতে ফিরে যাবার পালা। শাহপুর থেকে গুরুদাসপুর বাসট্যান্ড দেড় মাইল পথ। পদব্রজে ছাড়া বিকল্প পথ নৌকা।

প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। আমাদের পরিবার ছিল রক্ষণশীল। মিয়াবাড়ি–মোল্লাবাড়ির বৌ–ঝিদের দিনের বেলা বাইরে চলাচলে কঠোর অনুশাসন ছিল। দিনে বের হলে বর্ষাকালে ছইওয়ালা নৌকা এবং গ্রীষ্মকালে গরুর গাড়ি।

বর্ষাকালে বলে নৌকায় বাস স্ট্যান্ডে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। আবার সেই পানসি নৌকা, আবার সেই মাল্লা এবং আমি।

এবার নৌকা চলেছে নদীর উজানে। মাঝির গুণে টান পড়েছে। শরতের মেঘলা আকাশে ভেজা বাতাসে জরী আনমনা হয়ে আমার গা ঘেষে বসে। লজ্জায় ভীরু হয়ে সরে যাই। নাইনের ছাত্র। লাইনের ধারে নেই। জরী আবার পেছনে বসে বুকের অগ্রভাগ দিয়ে চাপ দেয়। তখন আমি বুকের ওপর ও দুটো স্বরবর্ণই বুঝতাম। ব্যঞ্জনবর্ণও যে হতে পারে সে ধারণা ছিল না।

নৌকাটি কিছু দূর উজানে চলার পর গুরুদাসপুর বাস স্ট্যান্ড অভিমুখে কাটাখালের দিকে গতি পরিবর্তন করে। জোনাইল–হরিপুর। অঞ্চল থেকে তীব্র বেগে পানি নেমে আসছে আত্রাই নদীতে। হরিপুর চলিত ভাষার পথিকৃৎ প্রমথ চৌধুরীর জন্মস্থান।

কাটাখালটি প্রায় ত্রিশ মিটার চওড়া। গুণের রশিটি টানে কটকট করে। আরেকটু সামনেই স্রোতী। স্রোতী হলো বাধা সৃষ্টি করে জলের বেগ বাড়িয়ে জাল টানিয়ে মাছ ধরার বিশেষ পদ্ধতি। সেটি পার হলেই ভয় থাকে না। ছইয়ের ওপরে–নিচে চারজন। আমি কাণ্ডারি। পানসি নৌকাটি স্রোতীর খুব কাছাকাছি চলে আসে। ভাটিতে আগত একটি বাজারি নৌকা তীরবেগে আত্রাই পানে ছুটে যায়। ঢেউ লেগে যায় পানসিতে। ভাবী ভয়ে জাপটে ধরেন নানিকে। নৌকাটি একদিকে কাত হয়ে যায়। ছলকে পানি ওঠে নৌকায়।

আমি ধমকে অন্য পাশে যেতে বলি। দুজন একত্রে অন্য পাশে যায়। বলি, দুজন দুপাশে থাকো। এ সময় ভাটিতে নামে আরো একটি ধান ভর্তি নৌকা। স্রোতীর স্রোতধারা এবং ঢেউয়ের তীব্রতায় গুণ ছিড়ে যায়। হালে ভারসাম্য থাকে না। নৌকাটি কাত হয়ে পানি ওঠে। ডুবে যায় খালের ভেতরে। চিৎকার করতে থাকে সবাই।

পানসির কিল (Keel) ভেসে ওঠে। ছই–পাটাতন আলাদা হয়ে ভাসতে থাকে। এবং সাতার না জানায় স্রোতের টানে ভেসে যায় ভাবী, নানি এবং জরী। আমি দ্রুত সাতরে কিনারে উঠি। একটু পরে টিপুও। আমি দৌড়ে ভাবীকে উদ্ধারের জন্য ভাটিতে যাই। খালপাড়ের বাসিন্দা এবং পথচারীরা সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। ভাবীকে টেনে তুলতে যাই। তিনি আমার গলা জড়িয়ে ধরতে চান। আমি ধাক্কা দিয়ে শাড়ি ধরে টেনে কিনারে নিয়ে আসি। ততোক্ষণে আধমরা। বুক পানিতে এনে পাড়ে টেনে তুলি।

পানিতে ভাবীর পেট ফুলে দশ মাসের পোয়াতির মতো অবস্থা। আমি ভাবীকে ঘাস–কাদামাটির ওপরে শুইয়ে দিই। পা দুটো চড়াইয়ের দিকে মাথাটা ঢালুর দিকে রেখে মুখটা ডান কাত করে রাখি। তারপর মুখে হাত দিয়ে দাত ছাড়িয়ে নিই। এবার পেটে চাপ দিতেই সহজে পানি বেরিয়ে আসে। আবার চাপ দিই। মুখে শাড়ির আচল লাগিয়ে কৃত্রিমভাবে শ্বাস দিয়ে পুনরায় পেটে চাপ দিই। পানি বের হয়ে আসে। ভাবী এক সময় নড়েচড়ে ওঠেন, ক্রমেই সুস্থ হন।

জরী হালকা সাতার জানায় টিপু তাকে ওপরে উঠিয়েছে। ভাটিতে স্নানমগ্ন এক রমণী মৃতের মতো নানিকে টেনে তোলেন। নানির পেটেও প্রচুর গাঙের পানি। নদীকূলবাসীরা জানে, পানিতে পড়া মানুষকে কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয়। সমাগত রমণীকূলের প্রচেষ্টায় নানির ধড়ে প্রাণ ফিরে পায়।

ঘটনাটি চারদিকে ছড়িয়ে পরে। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর কাজিন শাহ আলম বজরা নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়। এবং সকলকে সেখানে উঠিয়ে নেয়।

চলনবিল, নাটোর থেকে

মালয়শিয়াতে

মোহাম্মদ ইলিয়াছ মিয়া

২০০৩ সালে মালয়শিয়া সরকারের আমন্ত্রণে দুই মাসের ট্রেনিংয়ে যাই সেই দেশে। ট্রেনিংয়ের ফাকে ফাকে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল। এমনই এক ভ্রমণে যাচ্ছি মূল ভূ–খণ্ড থেকে চৌত্রিশ কিলোমিটার দূরে লংকাউয়ি–দ্বীপ (Lankawai Island)। আমরা ত্রিশ দেশের ত্রিশজন সদস্য এবং ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টের তিনজন। একজন গাইড ও বাসের দুজন ড্রাইভার আছেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের ট্রেনিংয়ে হচ্ছিল রাজধানী কুয়ালা লামপুরে। সেখান থেকে প্রায় চারশ কিলোমিটার দূরে পেরাক হয়ে যেতে হয় সেই দ্বীপে। বাস যেহেতু আমাদের রাজধানী থেকে পেরাক পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল এবং এই বাসে ফেরার ব্যবস্থা ছিল। তাই ড্রাইভার দুজনও সঙ্গে ছিল। অত্যাধুনিক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ফেরি। চৌত্রিশ কিলোমিটার যেতে সময় লাগে মাত্র দেড় ঘণ্টা।

আমরা সবাই মহাখুশি। হই চই, আনন্দ–ফূর্তি। বিশেষ করে আমি খুবই খুশি। যেহেতু বাংলাদেশে এমন জলযান কল্পনা করা যায় না। কিন্তু ঘটনা ঘটলো ফেরি ছাড়ার মাত্র পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেই। শুরু হলো প্রচণ্ড বাতাস। এক একটা ঢেউ আসে মনে হয় বুঝি ফেরি উল্টে যাবে। উপরে উঠে যখন আবার নিচে নামে তখন মনে হয় এই বুঝি তলা ফেটে গেল। দোতলা ফেরিতে মোট তিনশ যাত্রী। একেকজন বমি করে একাকার। তবে ফেরির দুই পাশে বসার সিটের মাঝখানে প্রতিটি থামে পলিব্যাগ ঝোলানো ছিল। এই ব্যাগ নিয়ে আমি এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জের এডি (Edde) যাত্রীদের মধ্যে বিলি করতে লাগলাম। আমার সঙ্গে বসা

নেপালের ভীম প্রসাদ ভট্টরায়, শ্রীলংকার যোশেফ পেট্রিক পিরিস এবং মালয় দুজন। পাশের সিটে এক ভদ্রমহিলা তার তিন ছেলেমেয়েসহ। এই ভদ্রমহিলার তিনটি ছেলে মেয়েই বমি করতে করতে করতে শেষে একদম নেতিয়ে গেল। তাকে আমি কয়েকটি পলিব্যাগ দিয়েছি।

আমার সামনের সিটে চল্লিশ বছর বয়সের ত্রিনিদাদ টোবাগোর মারিয়া, ইন্দোনেশিয়ার কৃহন্তা, ফিলিপিন্সের মাইতা আবুনালেস এবং মালদ্বীপের কুলসুম আলী রশিদ, কৃহান্তা দুবার তার স্বামীকে মোবাইলে ম্যাসেজ পাঠালো। সে কি জোরে জোরে কান্না। মারিয়া কাদতে পারলো না, তিনি ঘেমে ভিজে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে এখনই বেচারি হার্ট অ্যাটাক করবেন। পকেট থেকে টিসু বের করে তার কপাল মুছে দিচ্ছি। কৃহান্তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন কুলসুম আলী রশিদ এই বলে যে, তার জন্য এ অবস্থা কোনো ব্যাপারই না।

এদিকে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের সুঠামদেহের যুবক নেতানি সিটেই বসলেন না। তিনি ভয়ে বাথরুমের পাশে Exit-এর কাছে দাড়িয়ে রইলেন চোখ বন্ধ করে।

এর মধ্যে শ্রীলংকার প্যাট্রিক আমাকে বললেন, আমার বমি পাচ্ছে, আমি বাথরুমে যাবো।

বাথরুমে গিয়ে আর ফিরে এলেন না সিটে। বহুবার সিটে বসতে বললাম। কিন্তু বসলেন না। বসলেই নাকি তার বমি পায়। দাড়িয়ে রইলেন।

মালয়শিয়ার ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টের আবদুল রশিদ প্রথমে আমাদের সাহস যোগালেন। কিন্তু একটু পরে সেই বিরাট আওয়াজ করে বমি করতে লাগলেন।

তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরে বসিয়ে দিলাম। অন্যদিকে থাইল্যান্ডের কান্তারোজ, মরিশাসের সীতা দেবী গোমেনি, মেক্সিকোর মনিকা, ভিয়েতনামের ভেনতারানা হাই, জাম্বিয়ার নেলি, সোয়াজিল্যান্ডের ডকাস, বরকিনা ফাসোর ওমো, মালয়শিয়ার মোহাম্মদ জামরি, আবদুল রহমান এবং আলবেনিয়ার আলভার অবস্থা খুবই খারাপ। সেই অবস্থায় মনে মনে ভাবলাম এবার বুঝি মৃত দেহটিও আর খুজে পাওয়া যাবে না।

এমনি ভয়াবহ অবস্থায় মাঝে মধ্যে চালক ইঞ্জিন বন্ধ করে দেন যাতে ফেরি উল্টে না যায়। এভাবে দেড় ঘণ্টার পথ আমরা পাড়ি দিই প্রায় আড়াই ঘন্টায়। ফেরি থেকে জেটিতে অনেকেরই আর নামার সামর্থ নেই। ভিয়েতনামের হাইকে অপর তিন মহিলা ধরে অনেকটা পাজাকোলা করে নামালো।

এই দ্বীপে আমরা দুই দিন থাকলাম।

মালয়শিয়ার আবদুল রশিদ পরদিনই প্লেনে করে রাজধানীতে চলে গেল। আমরা বিদেশিরাও আর ফেরিতে ফিরতে রাজি হলাম না। সবাই বিমানে ফিরতে চাইলাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষের পক্ষে সেই খরচ যোগানো সম্ভব না হওয়ায় দুই দিন পর আবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই ফেরিতে চড়তে সকলেই বাধ্য হলাম। তবে প্রতিটি ব্যক্তির চেহারায়ই ছিল ভয় এবং বিরক্তির স্পষ্ট ছাপ। রাজধানীতে ফিরে আমরা প্রায় সবাই এ রকম বিপজ্জনক ভেনু বাদ দেয়ার জন্য আমাদের রিপোর্টে লিখলাম।

আজিমপুর, ঢাকা থেকে

যাইবানি হে ফারে

- আবদুর রহিম

আমার বোঝার বয়স থেকেই সপরিবারে বাবার ব্যবসায়িক কর্মস্থলে সংযুক্ত আরব এমিরেটস-এ অবস্থান করেছি। নদীমাতৃক প্রিয় মাতৃভূমির কথা কখনো মায়ের মুখে, কখনো দেশ থেকে আগত আত্মীয়স্বজনদের মুখে শুনে আসছিলাম। তখন থেকেই জানতাম প্রবাহমান এ নদীগুলোতে মানুষ যাতায়াত করতো নৌকার মাধ্যমে। তবুও দেখিনি বলে নৌকা চেনাও ওই ছোট্ট মন দিয়ে সম্ভব ছিল না। টিভিতে ছোট স্টিমার, বোট, জাহাজ দেখলেও নৌকা খুব একটা দেখতে পেতাম না। তাই মনে অদম্য আগ্রহ জন্মালো এই বস্তুটির প্রতি।

এক সময় দেশে পারিবারিক কারণে বাবা ছাড়া বাকি সকল সদস্যদের দেশে আসতে হয়েছিল। প্রিয় মাতৃভূমিকে দেখে রঙহীন আমার ছোট্ট জীবনটি হঠাৎ যেন রঙিন হয়ে পড়লো। এতো কিছু দেখার পরও নৌকা দেখাটাই হয়ে পড়লো আমার কাছে বিস্ময়কর ব্যাপার। তখন দুই তিনবার বাড়ির পাশের নদীতে শুধু এ পার ও পার যাওয়ার জন্য ছোট্ট নৌকাতে বসতে পারলেই কেমন জানি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। মাঝির দক্ষ হাতে বৈঠা বাড়ানো দেখতাম মুগ্ধ চোখে।

আমাদের গ্রাম সীমানার শেষে অবস্থিত নৌঘাট থেকে ওপারের নৌঘাট পর্যন্ত অন্তত এক কিলোমিটারের ব্যবধান হবে। একদিন হঠাৎ দুপুরে আমার এক সমবয়সী ফুপাতো ভাইকে নিয়ে বের হলাম নৌকা চড়বো বলে। ঘাটে এসে দেখি নৌকা ঘাটে বাধানো রয়েছে। কিন্তু মাঝি উপস্থিত ছিল না। মাঝির বাড়ি আমাদের গ্রামেই ছিল। দুজনের অনুমান করতে কষ্ট হয়নি যে, মাঝি দুপুরের খাবার খেতে বাড়িতে গেছে। হঠাৎ আমার মনে দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হলো। ভাইকে বললাম, চলো, আজ নিজেরাই নৌকা চালিয়ে ওপারে যাই।

তখন ভাইটি বললো, পরে আসবি কিভাবে? আমি জবাবে উত্তরে বললাম, পরেরটা পরে দেখা যাবে। এখানে বলে রাখা ভালো, সাতার জানি না বলে তখনো মা আমাকে টিউবওয়েলে অথবা পুকুরে মগ দিয়ে পানি ঢেলে গোসল করিয়ে দিতেন।

যেই বলা সেই কাজ। দুজনে উঠে পড়লাম নৌকায়। বৈঠা নিজের হাতে তুলে নিলাম। নিজের দৈর্ঘ-প্রস্থ এবং ওজন থেকে দ্বিগুণ বৈঠা তুলতে প্রথমে সমস্যা হলেও কৌতূহলের কারণে তা অনুভব করতে পারিনি। প্রথম ধাক্কায় কিছু দূর গড়ালেও পরে স্রোতে কোনো রকম নৌকা ভেসে চলছিল। কিছুক্ষণ পর বৈঠা মেরে দেখলাম স্রোতের বিরুদ্ধে না পারলেও নৌকা কোনো রকম এগিয়ে চলছিল। এভাবে প্রায় এক-চতুর্থাংশ পথ বাকা-টেড়াভাবে পরিভ্রমণ করেছি সবে আর তখনই সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি ঘটলো। হঠাৎ অজানা কারণবশত বৈঠা বাড়াতে পারছিলাম না। হয়তো ছোট্ট শরীরের শক্তি ফুরিয়ে এসেছিল। এরপরই ঘটলো চরম দুর্ঘটনাটি। হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন নৌকাটি বাড়ি খেল এবং অমনি নৌকা সামান্য কাত হয়ে পড়লো। তাল সামলাতে না পেরে মামাতো- ফুপাতো ভাই দুজনেই গিয়ে পড়লাম পানিতে। নদীতে স্রোত তীব্র না হলেও মোটামুটি স্রোত ছিল।

আমার ফুপাতো ভাইটি দেরি না করে সাতরিয়ে নদীর ওকূল অর্থাৎ আমরা যে কূল থেকে রওনা হয়েছি সেদিকে চলে যেতে লাগলো।

সাতার না জানা অসহায় আমি এখন কোনো রকম হাত পা চালিয়ে নৌকার কিনার ধরে আছি এবং চিৎকার করে আম্মু, আম্মু বলছিলাম। একে তো নির্জন দুপুর, মানুষ প্রাণী বিহীন দুকূলেই আমার ডাক শোনার মতো কেউ-ই সেখানে উপস্থিত ছিল না।

এক সময় মনে পড়ে, প্রথম প্রথম আমি পুকুরে যেতে চাইলে আমার ফুপু বলেছিলেন এ রকম পানিতে গেলে মানুষ আর ফিরে আসে না।

তখন ফুপুর কথাগুলো বার বার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। ভাবলাম আর বুঝি ফিরে যেতে পারবো না। আমার হাত-পা অনেকক্ষণ পানিতে থাকায় কেমন ফুলে উঠেছিল এবং হঠাৎ মনে হলো পৃথিবী অন্ধকারে ছেয়ে আসছে। অর্থাৎ ভয় কিংবা উত্তেজনায় আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেল এবং অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরলে নিজেকে বাড়িতে মায়ের বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখি। পুরো শরীর মনে হচ্ছিল জ্বরে পুড়ে একদম অচল, অবশ।

মা পাশেই বসেছিলেন। আমার জ্ঞান ফিরে আসায় আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না!

আমার দাদু-ফুপু সকলেই এসে যেন সে কান্নায় যোগ দিলেন।

পরে জেনেছি, আমার সাতারপটু ফুপাতো ভাইটি নদীর পাশ থেকে নৌকার মাঝিকে ডেকে নিয়ে এলে ওই মাঝিই আমাকে সাতরিয়ে কূলে এনে রাখেন। পরে ওই ফুপাতো ভাই বাড়ি থেকে অন্যান্যদের ডেকে আনে।

আজ এতো বছর পর ঘটনাটি মনে হলে ভয়ে লোম খাড়া হয়ে যায়। এরপর সাহস করে নিজেই সাতার শিখে নিয়েছিলাম।

এখনো ওই নদীর পাড়ে গেলে সে পুরনো নৌকাটি না থাকলেও সে মাঝি যিনি আমাকে বাচিয়েছিলেন তিনি এখনো বেচে আছেন। দেখলেই বলেন, *যাইবানি হে ফারে*।

এ কথা শুনলেই হেসে ফেলি।

ইউএই থেকে
rahim7335318@yahoo.com

প্রথম এবং শেষ

- ফিরোজা বেগম

এপৃল ১৯৭১-এর মাঝামাঝি। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকের কথা। ঢাকা থেকে প্রাণের ভয়ে গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছে মানুষ। আমরাও সেই দলে। নানান শ্রেণীর, নানান বয়সের মানুষ। ছোট একটা পুটলি সবার সঙ্গে। বাচ্চা কাধে মা, সঙ্গে কারো স্বামী আছে, আছে আরো দুই চারটা ছেলেমেয়ে। কারো সঙ্গে আছে বৃদ্ধ বাবা-মা, নানা-নানি বা দাদা-দাদি। কারো সঙ্গে আছে জোয়ান মেয়ে। সবার চোখে আতংক। কারো মুখে কথা নেই, ভাষা নেই। বাচ্চারাও যেন কাদতে ভুলে গেছে। এক সময়ে আমাদের স্কুটার নদীর তীরে পৌছালো।

সবাই হুড়োহুড়ি করে নৌকায় উঠছে যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে। আমিও আমার বাবুকে কোলে নিয়ে নৌকায় পা দিলাম। জীবনে প্রথম নৌকায় ওঠা। বাবুর আব্বি আমাদের নৌকায় তুলে দিয়েই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে বসা, একটু নড়াচড়া করার উপায় নেই। কোনো পরিচিতজন নেই। সব অপরিচিত মুখ। ভীত-সন্ত্রস্ত চেহারা। মলিন মুখে সবাই আল্লাহর নাম নিচ্ছে।

এতো বড় নৌকা কখনো দেখিনি। আর এক সঙ্গে এতো লোক এক নৌকায় উঠতে পারে এ ধারণাও আমার ছিল না। ওই নৌকায় আমরা প্রায় আশিজন ছিলাম।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। নৌকা ছাড়লো। হেলেদুলে নৌকা চলছে। ভয়ে আমার বুক কাপছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, সাতার জানি না। কোলে আমার নয় মাস বয়সের সন্তান। নৌকা ডুবে গেলে কি করবো? গা শির শির করছে। ভয়ে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। বাবুর আব্বি নৌকায় উঠেছেন কিনা জানতে পারলাম না। পুরুষ মানুষেরা আলাদা জায়গায় বসেছে। যেতে যেতে আমার হযরত নুহ (আ.)-এর জাহাজের কথা মনে পড়লো। সেই ঘটনার সঙ্গে এই নৌযাত্রার কোনো মিল নেই শুধু এক প্রাণ বাচানো ছাড়া।

মনের মধ্যে নানান কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। জীবনের নানান পাওয়া না পাওয়ার বেদনা, কতো স্বাদ-আহ্লাদ। এই রাত কি ভোর হবে? আমরা কি নিরাপদ দিনের আলো দেখতে পাবো? বেচে থাকবো তো? আমার বাবু বড় হবে? আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবো? দেশ কি স্বাধীন হবে? রক্ত লোলুপ হায়েনার দল ধ্বংস হবে, হবে বিতাড়িত? দেশকে স্বাধীন করতে কতো দিন, কতো বছর লাগবে? ভিয়েতনামের মতো কি বছরের পর বছর আমাদের যুদ্ধ করে যেতে হবে? আমি কি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারি না কোনোভাবে? কতোজনকে প্রাণ দিতে হবে কে জানে!

শুধু পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। মাঝে মধ্যে মাঝি-মাল্লাদের হাকডাক। অন্য নৌকার মাঝিদের সঙ্গে সংবাদ লেন-দেন। ছোট ছেলেমেয়েরা খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করছে। মুড়ি-চিড়ায় চলবে না, ভাত চাই। অবুঝ শিশু। কেউ কেউ শুতে চায়। কিন্তু ঠাই নেই, ঠাই নেই। বসে বসে ঘুম চোখে সবাই দুলছে।

কয়েক ঘণ্টা যাওয়ার পর শুনলাম নৌকা দাউদকান্দি পার হয়ে যাচ্ছে। এখানে লোকজনের বেশ হই হুল্লোড় শোনা গেল। আরো কিছু দূর যাওয়ার পর বিভিন্ন ঘাটে কিছু লোকজন নামিয়ে দেয়া হলো। যেতে যেতে রাত ভোর হয়ে গেল। আমরা একটা ঘাটে নামলাম। সেখানে ছোট নৌকায় উঠতে হলো। এতো ছোট নৌকা, সম্ভবত ডিঙি নৌকা। নড়াচড়া করলে কাত হয়ে যায়। নৌকা কিছুদূর গিয়ে সরু খালের মধ্যে ঢুকলো। খালের দুই ধারে বিস্তৃত ধানক্ষেত, পাটক্ষেত। দূর দিগন্তে নীল আকাশে সবুজ মাঠকে আলিঙ্গন করছে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে নানান রঙের পাখি। কিন্তু এসব উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা নেই। শুধু চিন্তা, নিরাপদ ঠিকানায় পৌছাতে পারবো তো? আমার নয় মাসের নয়নের মণিকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো তো?

সঙ্গে ফ্লাস্কে গরম পানি, এখন আর তেমন গরম নেই। দুধের কৌটা ও চিনির কৌটার সঙ্গে আরেক কৌটায় আমার সামান্য দুই চারখানা গয়না। গহনাগুলোকে আমার আরেক আপদ বলে মনে হচ্ছে। এগুলোর জন্য অহেতুক দুশ্চিন্তা। কিন্তু এগুলোই তো আমাদের মতো মধ্যবিত্তের দুঃসময়ের পুজি। তাই আপদ মনে হলেও বিপদে ত্রাণ পাওয়া যাবে সেই আশায় সঙ্গে রাখা।

দুধ বানিয়ে বাবুকে খাওয়াতে চাইলাম। ও যেন খাওয়া ভুলে গেছে। খাওয়া ছেড়ে অসহায়ভাবে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। রোদের তেজ বাড়ছে। সারা রাত খাওয়া নেই, ঘুম নেই। বাবু কয়েকবার হিসু করে দিয়েছে কোলে। গরমে ঘেমে কাপড়–চোপড় দুর্গন্ধ। ক্ষিধে ও ঘুমে শরীরে অবসাদ নেমে আসছে।

অবশেষে বেলা দশটার দিকে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌছালাম। এটা বাবুর বড় চাচির বাবার বাড়ির কাছের ঘাট। দাউদকান্দির কাছাকাছি একটা গ্রাম। নাম কানাইরকান্দি। ঘাটে বাবুর বড় চাচি, চাচাতো ভাইবোনদের দেখা পেলাম। তারা প্রায় সাত আট দিন আগে এসে পৌছেছেন। পুরো পরিবার এক সঙ্গে না এসে আলাদাভাবে তিনবার আসা হলো।

বাবুর আব্বি আমাদের পৌছে দিয়ে সপ্তাহ খানেক পর ঢাকায় ফিরে গেলেন। গ্রামে আমরা ভালোই ছিলাম। আদর, আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি ছিল না। ট্রানজিস্টরে স্বাধীন বাংলার খবর শুনে দিনগুলো উদ্দেশ্যহীনভাবে তরতরিয়ে চলে যাচ্ছিল। এক রাতে ঢাকার খবরে শুনতে পেলাম, সব সরকারি কর্মচারীদের কাজে যোগ দিতে হবে। আমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। আমি সরকারি স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা।

ঢাকায় ফেরার জন্য বাবুর আব্বি লোক মারফত খবর পাঠালেন।

বাবুর চাচির এক মামার সঙ্গে (নজরুলমামা) ঢাকায় রওনা দিলাম। একটা নৌকা ভাড়া করা হয়েছে। নৌকা একেবারে সোজা ঢাকায় পৌছে দেবে। ভোরবেলা রওনা দেয়া হলো। দুরু দুরু বুকে নৌকায় উঠলাম। ভাবতে গা শিউরে উঠছে। বাবুকে ঢাকার বাসায় একা কাজের লোকের কাছে রেখে কি করে প্রতিদিন ঢাকা–নারায়ণগঞ্জ যাতায়াত করবো। আমার যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে বাবু কিভাবে বাচবে? কার কাছে মানুষ হবে?

খাল পেরিয়ে নৌকা নদীতে গিয়ে পড়লো। বিশাল মেঘনা নদী। উপরে খোলা আকাশ, নিচে চারদিকে থই থই পানি। প্রচুর হাওয়া, রোদের তেজ গায়ে লাগছে না। বাবুর ডায়ারিয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দেখে বোঝার উপায় নেই এক বছর বয়সের বাচ্চা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কাদছে আর বার বার পায়খানা করছে। তাকে পরিষ্কার করছি এবং নদীর পানিতে কাথা ধুয়ে শুকাতে দিচ্ছি। মাঝে মধ্যে দূরে কি যেন দেখা যাচ্ছে, নদীতে ভেসে যাচ্ছে কলা গাছের মতো। কিন্তু কলা গাছ এতো ছোট হবে কেন? মামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওগুলো কি?

মামলা বললেন, লাশ।

চমকে উঠলাম। মরা মানুষ পানিতে ভাসলে ফুলে এতো মোটা হয়ে যেতে পারে! তারা পাকসেনা না আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা কে জানে! কিছু দূর যাওয়ার পর আর লাশ দেখতে পেলাম না।

অসুস্থ বাবুকে নিয়ে দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের মধ্যে সারাটা দিন কিভাবে কেটে গেল জানি না। ঢাকার নদীর ঘাটে বাবুর আব্বিকে দেখতে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। এমনি আতংকে ও সংশয়-সংকুল সময়ে ঘটেছিল আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ নৌকা ভ্রমণ যা আমার মনে এখনো মাঝে মধ্যে দুঃস্বপ্নের মতো উকি মারে।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

বর্ষাকালে

– এ.এন ওয়াহিদ

আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। এক বর্ষাকালে ছোট একটা নৌকায় বেড়াতে বেরিয়েছি এক বন্ধুর সঙ্গে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একটা গ্রামীণ দোকান থেকে কিছু বিস্কিট কেনা ও তা নিয়ে খাওয়া এবং ফেরার পথে কলমি শাক কাটা। সঙ্গে ধান কাটার কাচিও ছিল।

দোকানঘাটে নামতে কিছু পথ হাটু পানি বেয়ে যেতে হলো। হঠাৎ সে সময় একটা ঢোড়া সাপ আমার পায়ে কাপড় দেয়। যেহেতু গোবরের কাছে ছিল জায়গাটা তাই বিষের জ্বালায় বেহুশ হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গী বন্ধুটি নাকি সঙ্গে কাচি দিয়ে সাপে কাটা পায়ের জায়গা আরো কেটে দিয়েছিল ও হাটুর নিচে একটা রশি দিয়ে বান দিয়েছিল, তাই রক্ষা।

তারপর সঙ্গী বন্ধু আমাকে নাকি একটা ওঝা যে সাপের বিষ ছাড়ায়।

আমার যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি কলাপাতায় শোয়ানো। পায়ের ক্ষতস্থান ব্লেড দিয়ে ছোট ছোট করে কাটা। বিষের জ্বালা থেকে মুক্ত হতেই দেখি আমার চারপাশে লোকজন ভিড় করছে।

যিনি সাপে কাটার জ্বালা থেকে মুক্তি দিলেন তিনি ছিলেন আমার শ্বশুর। তিনি বিষ ছাড়াতে পারতেন মন্ত্রবলে। মুরুব্বি বলে এবং যেহেতু এতোক্ষণ পায়ে ধরে বিষ ছাড়াচ্ছেন, তার জন্য ক্ষমা চাইতে হলো।

সে ঘটনা এখনো মনে হলে গা শিহরিত হয়ে ওঠে। নৌকা ছিল বলেই সেদিন তড়িঘড়ি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

একবার নৌ ভ্রমণে এক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পড়ি। সেটা ছিল ১৯৫৩ সালের কথা। বিয়ের বছর। স্ত্রীকে নিয়ে একটা ছোট নৌকায় নিজ বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলাম। নৌচালক আমি এবং যাত্রী বিবিসাব।

একদিকে বৈঠা দিয়ে নৌকা বেয়ে চলছিলাম, অন্যদিকে সে বসে আছে কাছেই। চাদনি রাত। বর্ষাকাল। রোমান্টিক পরিবেশ। সম্ভবত গানও গেয়ে যাচ্ছিলাম :

নদীর কূল নাই, কিনারা নাইরে...।

বর্ষাকালে সব জায়গায় পানি আর পানি। এমনকি গ্রামের কাঠের পুলটিও প্রায় ডুবুডুবু। পুলটির মাঝামাঝি একটি ফাকা। সেই ফাকটুকু দিয়ে ছোট নৌকাটা নিয়ে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড স্রোতে নৌকাটি উল্টে যায় ও আমরা পানিতে ডুবে যাই। একদিকে সাতার কাটছি ও অন্যদিকে নৌকার একটা গলুই ধরে পানিতে ভাসছিলাম। এবং অন্য একটা অংশ বিবিসাব ধরে আছে। হঠাৎ একটা শিশুল গাছ পেয়ে যাই যা ছিল কাটায় ভর্তি। জীবন বাচাতে কাটা গাছই ধরে বসলাম। কি যে পরিস্থিতি তা কল্পনাও করা যায় না। ভাগ্য ভালো, তাই সে যাত্রায় বেচে গেছি।

ধন্যবাদ বিবি সাহেবকে। তার চেষ্টায় সেদিন আমরা বেচে গিয়েছিলাম। শুধু বাচা নয়, একেবারে অক্ষত অবস্থায়। নৌকাটাকে পানিতে রেখেই আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে ছোট্ট কোষা নৌকাটাকে আবার সোজা করে পানি সেচে, কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে কাপড় বদলাতে হলো।

শ্বশুরবাড়ি যখন পৌছি তখন চুপে চুপে রান্নাঘরের চুলার আগুনে কাপড় শুকানো হয়। আসল ঘটনা কাউকে বলা হয়নি। শুধু বলেছিলাম দুষ্টুমি করে একে অপরকে ভিজিয়ে দিয়েছি। নিজ বাড়ি ফেরার পথে বন্ধুর বাড়ি থেকে ধার করা কাপড় ফেরত দেয়া হয়।

আজ এতো বছর পর সেদিন টিভি ভবনে হঠাৎ বিবি সাহেব বলে ওঠে, হ্যা গো! যদি সেদিন দুজনে মরে যেতাম তাহলে কি বিটিভি–র *লাল–গোলাপ* অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারতাম?

আমি বললাম, জানো তো *প্রেমের মরা জলে ডোবে না।* আমরা মরে গেলে পরদিন গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসতো। নব্য লায়লী–মজনু রূপকথা হয়ে যেতাম আর কি।

ঝিগাতলা, ঢাকা থেকে

বিউটিস্পটে

– সায়ফুল ইসলাম

তিন বন্ধু মিলে একবার বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে প্রথমে ইটালির মাটিতে পা রাখলাম। পাতাল ট্রেন, ট্রাম আর ইলেকট্রিক বাস–ট্রেনে রোমের এ প্রান্ত সে প্রান্ত ঘোরা শেষে জলযানের দিকে নজর দিলাম। এবার ইঞ্জিনবোটে যাবো সাগরের বিউটিস্পট ক্যাপরি (Capri)। পর্যটকদের একটি বিশেষ আকর্ষণীয় স্থান। মাত্র দশ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক দ্বীপ শহরটি সেকালে রোমান সম্রাটদের অবকাশ যাপন কেন্দ্র ছিল।

প্রায় ঘণ্টা খানেকের সমুদ্রযাত্রা। ভয় ও আনন্দের সংমিশ্রণে এক বিচিত্র অনুভূতি ভরা এই যাত্রা। এ তো খাল–বিল আর হাওড় পাড়ি নয়, রীতিমতো সাগর পাড়ি। দ্বীপটির সবদিকে ছড়িয়ে আছে হাজারও রঙবেরঙের ছোট নৌকা ও স্পিডবোট। পর্যটকরাই যার একমাত্র গ্রাহক।

এরপর আমরা চলে গেলাম ইটালির আরেক বৈচিত্রময় শহর ভেনিস। প্রায় একশটি ক্ষুদ্র দ্বীপ সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই জলে ভাসা ঐতিহাসিক শহরটি। অসংখ্য সরু খালের দুই পাশে বহুতল বিশিষ্ট সুরম্য দালান–কোঠা। দেখে মনে হয় পানিতে ভাসছে সব। ফুটপাথ থেকে সিড়ি নেমে গেছে সরু খালগুলোতে। তাতে ভেসে বেড়াচ্ছে রাজহাসের মতো অসংখ্য রঙয়ের বাহারি গন্ডোলা (Gondola)। ভেনিসদের ঐতিহ্যবাহী পরিবহন ছোট নৌকা। এই গন্ডোলায় চড়ে চলে তাদের নিত্যদিনের অফিস–আদালত, হাট–বাজার।

ভেনিসের অন্যতম একটি বিশেষ আকর্ষণ নৌকা বাইচ। এক রবিবার আমরাও নৌকা বাইচ দেখতে নদীর পাড়ের বেঞ্চে বসে পড়লাম। সরু ও লম্বা সাইজের অনেক নৌকায় প্রতিটিতে বিশ বাইশজন প্রতিযোগী মাল্লা। তাদের এক তালে অতি দ্রুত দাড় টেনে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের এ অপূর্ব দৃশ্য সত্যিই উপভোগ্য। নদীর দুই পাড়ে অপেক্ষমাণ উৎফুল্ল শত সহস্র দর্শকবৃন্দ মুহুর্মহু করতালিতে মাল্লাদের উৎসাহিত করতে থাকে।

ভেনিস থেকে ট্রেনে আমরা বেলগ্রেড পৌছালাম। সিটের আশায় ইয়ুথ হস্টেলে গিয়ে নিরাশ হলাম। তবে নিরাশ হইনি শস্তা হোটেলের ঠিকানা চেয়ে তাদের কাছে। সেই ঠিকানা মিলিয়ে দানিয়ুব নদীর তীরে পৌছে শুধু কয়েকটি লাকশারি লঞ্চ ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দেখলাম।

এ কেমন রসিকতা, চাইলাম শস্তা হোটেলের ঠিকানা! আর পেলাম লাকশারি লঞ্চের খোজ। চাওয়া–পাওয়ার গরমিলে আবারও নিরাশ হয়ে তাদের মুণ্ডুপাত করার উদ্যোগ নিতেই জানতে পারলাম ওই ভাসমান লঞ্চগুলোই আবাসিক হোটেল। পরিত্যক্ত লঞ্চগুলোকে হোটেলে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

শস্তায় এতো সুন্দর আয়োজন দেখে চমৎকৃত হলাম। দানিয়ুবের ফুরফুরে হাওয়া খেয়ে পরম শান্তি ও নিরিবিলিতে গভীর ঘুম দিয়ে সারা দিনের ঘোরাঘুরির ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে তিনটি সিঙ্গল রুমের বরাদ্দ নিলাম।

কিন্তু হা-হতোস্মি! সে আশায় গুড়ে বালি। সন্ধ্যার পর থেকে লঞ্চের বারটি জমজমাট হয়ে উঠলো। শুরু হলো বাদ্যের তালে তালে নাচ আর গান। ঘুমানোর সাধ্য কার। রাতের গভীরতায় তাদের গানবাদ্য আর নৃত্যের উদ্দামতাও বাড়তে থাকে।

নিরুপায় আমরা ওই ঢাকঢোলের মধ্যেই চোখ-কান বুজে সপ্তাহ খানেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিলাম।

এ জনমে রকেটে ভ্রমণের শখ কষ্ট কল্পনা হতে পারে। কিন্তু জাহাজে ভ্রমণের শখ অপূর্ণ থাকবে, এতো হয় না! সেই শখ পূরণের লক্ষ্যে সিসিলির কাতানিয়া সমুদ্রবন্দর থেকে জাহাজে মল্টা যাবার প্ল্যান নিয়ে রোম থেকে ট্রেনে চাপলাম।

কাতানিয়া পৌছে জাহাজের টিকেট নিলাম। ট্রেনের শেষ কয়েকজন প্যাসেঞ্জার নিয়ে জাহাজটি হুইসল বাজিয়ে নোঙ্গর তুললো।

প্রায় সাত ঘণ্টার সাগর পাড়ি। সমুদ্রের অসীম সৌন্দর্য উপভোগের বাসনা নিয়ে জাহাজের উচু পাটাতনে উঠে বসলাম।

চতুর্দিকে ভূবেষ্টিত বলে ভূমধ্য সাগর শান্ত সাগর রূপেই পরিচিত। তাই বলে এ সাগর একান্তই ঢেউহীন শান্ত দীঘির মতো তা নয়। উপকূল ছেড়ে যাবার পর জাহাজের নাচন দেখে তার প্রমাণ পেলাম। যতোই এগোচ্ছে ততোই জাহাজটি সুবিশাল ঢেউয়ের তালে তালে লাফাতে থাকলো।

সমুদ্রযাত্রায় অনভ্যস্ত আমরা ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। বমি করে অনেকের বেহাল অবস্থা। মাথার চক্করে মনে হচ্ছিল সাগরসহ পৃথিবীটা নাগরদোলায় দুলছে।

রাত প্রায় একটায় জাহাজ যখন মল্টার রাজধানী ভ্যালেটা-য় ভিড়লো তখন আমরা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। ব্যাগটি ঘাড়ে চাপিয়ে টলতে টলতে জাহাজ থেকে নেমে এলাম। ক্লান্তি আর অবসাদে ফুটপাথেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। খালি একটি ট্যাকসি পেয়ে আমাদেরকে একটি বোর্ডিংয়ে তুলে দিতে বললাম।

ট্যাকসি ড্রাইভার যে ভাড়া হাকালো তাতেই বিনা বাক্য ব্যয়ে রাজি হয়ে গেলাম। রাতের এই প্রহরে অবসাদগ্রস্ত দেহে দরদস্তুরের প্রশ্ন অবান্তর।

কয়েকটি অলিগলি অহেতুক চক্কর দিয়ে একটি অখ্যাত হোটেলের সামনে গাড়ি থামিয়ে ভেতরে গেল সে। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে সহাস্যে বললো, নেহাৎ ভাগ্য বলে একটি থ্রি সিটেড রুম পাওয়া গেছে।

অশেষ ধন্যবাদসহ তার ভাড়া মিটিয়ে আমরা ভাগ্যবানরা হোটেলে উঠে পড়লাম। মাথায় তখনো চক্কর, পেটে প্রচণ্ড ক্ষিধে আর চোখে রাজ্যের ঘুম, এমন বেহাল অবস্থায় কখন যে তিন আদম বিছানায় লেপ্টে গেছি বলতে পারবো না।

বেশ একটু দেরিতেই ঘুম ভাঙলো। ব্যালকনিতে দাড়িয়ে চোখ কচলে দেখি ওই তো কয়েকশ গজ দূরেই জাহাজঘাট। দুই মিনিট হাটলেই ওই হোটেলে পৌছে যেতাম।

জাহাজের চক্করে ট্যাকসি আর হোটেলের গলাকাটা ভাড়া গুনে কেমন গোল খেলাম তা ভাবতেই মাথাটা আবারও চক্কর দিয়ে উঠলো। দ্রুত ব্যাগ কাধে ঝুলিয়ে ততোধিক দ্রুত বেগে সেখান থেকে কেটে পড়লাম।

জাহাজের সেদিনের সেই চক্করের কথা মনে পড়লে আজো অজান্তে মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে।

সউদি আরব থেকে